শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গুহামানব

একদিন প্রয়াতা স্ত্রী সুস্মিতাকে স্বপ্নে দেখেছিলেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল বটকৃষ্ণ রায়। সুস্মিতা বলেছিল, সে এখন আছে গোধূলিতে। না আলো না অন্ধকারের মাঝামাঝি একটা আবছায়া জায়গায়। বটকৃষ্ণের জীবন জুড়ে কি সেই গোধূলির ঘেরাটোপ ? পুত্র সঞ্জয় আই পি এস। ছেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শীতল। ফিগার-সচেতন পুত্রবধূ পিঙ্কি মানুষটাকে অপছন্দ করে। চুয়ান্ন বছর বয়সেও বটকৃষ্ণের চেহারা মজবুত। দুখানা চোখ ভীষণ তীক্ষ্ণ। সাহসী বটকৃষ্ণ কারও সাহায্য নেন না। আপন মনে ঘরে থাকেন, ভোরবেলায় লেকে জগিং করতে যান। যেন গুহা থেকে বেরিয়ে আবার নিজের গুহায় ঢুকে পড়েন। অথচ বহু বছর আগে বটকৃষ্ণকে মাত্র তিন ঘণ্টার জন্যে দেখে স্ত্রীর বান্ধবী অপরাজিতা এখনও গভীর সম্মোহনে ডুবে আছে। এমন একজন মানুষের সঙ্গে সমাজ ও সংসারের সম্পর্ক কেমন ? গভীর আবেগের কোন অতলই বা স্পর্শ করে আছেন বটকৃষ্ণ ? সেই কাহিনী এখানে।

ISBN 81-7215-905-6

গুহামানব

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

রাতের খাওয়ার টেবিলে সাধারণত কোনও শব্দ হয় না। শুধু প্লেটে চামচের শব্দ ছাড়া। দুটো লোক টেবিলের একটা সমকোণের দু পাশে বসে। বাপ আর ছেলে। বটু বা বটকৃষ্ণ রায় আর তার ছেলে সাজু বা সঞ্জয়। বটু আর্মির অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, সঞ্জয় আই পি এস। শুধু এই রাতের খাওয়ার টেবিলেই দুজনের দেখা হয়, যদি না সাজুর কোনও পার্টি থাকে। দেখা হয়, কিন্তু দুজনের মধ্যে কথা হয় কদাচিৎ। কথার কিছু নেই তাদের মধ্যে। কারও কাউকে বলার মতো কিছুই থাকে না প্রায়।

আজ হঠাৎ খাওয়ার মাঝামাঝি একটা অবস্থায় বটু মুখ তুলল। উল্টোদিকের দেওয়ালে দুটো আসল তলোয়ার ক্রস করে রাখা, তাদের ওপরে একটা আসল ঢাল। ঢালটায় পেতলের কাজ আছে। সেই ঢালটার দিকে চেয়ে এবং সেটাকে একেবারেই লক্ষ না করে ভারী আনমনে বটু বলল, ওইখানে একটা গোধূলি রয়েছে।

সাজু মুখ তুলে তাকাল, কপালে ভ্রূকুটির ভাঁজ। কাঁটা-চামচে বিদ্ধ একটি ফিঙ্গার চিপ্‌স্‌কে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে বলল, কী আছে?

বটু হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে লজ্জিত হয়ে মাথা নাড়ল, না, কিছু না।

সঞ্জয় তার বাবার দিকে একটু কঠিন চোখে চেয়ে থেকে বলল, আরও একদিন— পরশুই বোধহয়— তুমি কী একটা বলেছিলে। আর ইউ মাটারিং টু ইওরসেল্‌ফ্‌?

খুবই লজ্জায় পড়ল বটু। আজকাল দুটো একটা কথা বেরিয়ে যায়।

ইজ সামথিং রং বাবা?

না না, কিছু একটা ভাবছিলাম বোধহয়।

বউমা— অর্থাৎ সাজুর বউ এসে দাঁড়াল সাজুর পাশেই।

আঠারো উনিশ বছরের বাচ্চা বউ। মাত্র চার মাস আগে বিয়ে হয়েছে। সে শ্বশুরমশাইয়ের দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে। বউমাটি— অর্থাৎ পিঙ্কি ঠিক কেমন মেয়ে তা বটু জানে না। শুধু এটুকু জানে মেয়েটি অসম্ভব স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য সচেতন। হেলথ ক্লাবে যায়। বাড়িতেও নানা রকম যন্ত্র নিয়ে ব্যায়াম করে এবং তার খাওয়াদাওয়াও একদম অন্যরকম। লাঞ্চ ডিনারের বালাই নেই, কী সব সব্জি আর ফলের রস, মধু আর দই এসবই খায়টায়। শরীর নিয়ে এত উল্টোপাল্টা খায় কেন কে জানে বাবা। এইসব শারীরিক ব্যাপার এবং বি.এসসি ও জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রস্তুতি নিয়ে পিঙ্কি এতই ব্যস্ত যে বটুর সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয়ই না বলতে গেলে।

তাদের কুক বা রান্নার লোকটি— নাম ধরম— রায়তা না যেন কী একটা নিয়ে এল। বটু বলল, না থাক। আমি উঠছি।

বটু উঠে পড়ল। আঁচিয়ে চুপচাপ নিজের ঘরে চলে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মাঝে মাঝে তাকে যে এরকম লজ্জায় পড়ে যেতে হয়েছে তার কারণ তার কিছু ভিশন— মানে বল্গাছাড়া কল্পনায় ভর করে আসা কিছু বিচিত্র অবলোকন। যেমন পরশু সে শেষ রাতে তার স্ত্রীর ভূতকে দেখতে পেল। একটা মেঘলা মতো উঁচু জায়গা থেকে টুক করে নেমে এল। মুখোমুখি হয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, কী ভেবেছ তুমি? অ্যাঁ! কী ভেবেছ?

বটু একটু অবাক হয়ে বলল, ওই মেঘটা থেকে নামলে? ওটার ওপরে কী আছে বলো তো!

ওটাই গোধূলি। আলো না, অন্ধকারও না। ও তুমি বুঝবে না। কী করছ বল তো আজকাল! কোনও খবর পাই না।

আমার খবর! সে কিছু নয়। বসে থাকি, শুয়ে থাকি। একটু জগিং করি সকালে। বিকেলে বেড়াতে যাই।

ছেলেরা?

তারা তাদের কাজটাজ নিয়ে ব্যস্ত। পরঞ্জয় পুণার মিলিটারি একাডেমিতে। এ বছরই বেরবে। আর সঞ্জয়—

ওসব জানি। আমি জানতে চাই, তোমার সঙ্গে ছেলেদের বনিবনা কেমন?

খারাপ কী?

বউমা?

ভালই তো।

এড়িয়ে যাচ্ছ। বউমার মতিগতি কেমন বুঝছ?

ওসব মেয়েরা বুঝতে পারে। আমার সঙ্গে তার দেখাই হয় না। শরীরচর্চা নিয়ে সে ভারী ব্যস্ত।

বাচ্চা মেয়ে। শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়।

কী শেখাব? আর সে শিখবেই বা কেন? সঞ্জয় দু দিন পর জেলায় বদলি হয়ে যাবে। আবার কবে তাদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হবে কে জানে। শিখিয়ে লাভ কী? ভুলে যাবে। আর শেখানোর আছেই বা কী?

ব্যবসাদারের মেয়ে। বাপের টাকার গরম আছে। ভাল শিক্ষা কি আর পেয়ে এসেছে? এ বাড়ির সহবত শেখানোর দরকার ছিল।

না, আমি শেখানোর মতো কিছু তো জানিই না। তুমি হয়তো পারতে। মেয়েরাই পারে। মেয়ে তো তুমিই পছন্দ করেছিলে।

তখন তাড়াহুড়ো ছিল। আমার ক্যানসার বুকে ছড়িয়ে গিয়েছিল। বাছাবাছির সময় ছিল নাকি? বিয়ের পর দু মাসও তো বাঁচলুম না।

ছেড়ে দাও। কাউকে আমাদের কিছু শেখানোর নেই। ওরা যা ভাল বোঝে তাই শেখে, আমরা যা ভাল বুঝি তা ও শিখবে কেন?

এইজন্যই তো তোমার ওপর আমার রাগ। কম্যান্ড নেই। কী করে যে মিলিটারিতে চাকরি করতে।

ভাবছ কেন? উই হ্যাভ গুড রিলেশনস। তার চেয়ে বরং তোমার ওই গোধূলির কথা বলো। তোমার মাথার ওপরে একটা মেঘ থমকে আছে। ও কি কুয়াশা?

কী করে বোঝাব ওটা কী। ওটা গোধূলি। আলো না, অন্ধকারও না। যেন একটা সন্ধেবেলা থেমে আছে।

শুধুই সন্ধে?

শুধুই সন্ধে।

কারা আছে ওখানে?

এই আমরা। যারা মরে যায় তারা।

কী করো তোমরা?

কী করব? এখানে তো কোনও কাজ নেই। শুধু অপেক্ষা।

কীসের অপেক্ষা?

তা কেউ জানে না। বউমাটাকে নিয়ে আমার চিন্তা হচ্ছে। সাজুকে ঠিকমতো দেখভাল করবে তো?

করবে।

কী করে বলছ? তুমি তো ওকে ভাল করে চেনোই না।

তাতে কী? আন্দাজ করতে পারি।

তোমায় যত্নআত্তি করে?

আরে, আজকাল পয়সাওয়ালাদের ঘরে ওসব পার্সোনাল অ্যাটেনশন বলে কিছু থাকে না। চাকর, রান্নার লোক এরাই করে যা করার।

ও আবার কী কথা! চাকরবাকর তো আমাদেরও ছিল। তা বলে—

পিঙ্কির প্রিঅকুপেশন আছে বলছি তো। সে ভাবী ডাক্তার, তার ওপর হেলথ্ ফ্রিক, তার সময় কই?

ভাবছি, বিয়েটা ভুল দিলুম নাকি?

আরে না। বিচার করতে বসলে বেশিরভাগ বিয়েই তো ভুল বিয়ে। সাজু পুলিশ অফিসার। সে সব সামলে নিতে পারবে। বউমা কিছু খারাপ নয়।

লজ্জা শরম আছে তো! নাকি তোমার সামনেই ঢলাঢলি করে?

না না, ওসব ওদের বেডরুমে যা হওয়ার হয়। ওদের বেডরুম আর আমার বেডরুমের মাঝখানে হলঘর। আমি কিছু টের পাই না। তুমি বরং গোধূলির কথাটা বলো। ঠিক কেমন জায়গা?

ধোঁয়াটে। সব আবছামতো। কেমন যেন। কোনও শব্দ নেই, কোনও গতি নেই, কোনও পরিবর্তন নেই। সব চুপচাপ। কিছু

ঘটে না এখানে।

খুব বোরিং?

না, তাও নয়। কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব। আবার জেগেও আছি।

আমাদের কথা মনে পড়ে?

পড়ে। তবে স্বপ্নের মতো, যেন দূরের কোনও ঘটনা। তোমরা যেন আমার কেউ নও।

ওখানে চেনা কেউ আছে?

না গো। এখানে কেউ কারও চেনা নয়।

কথাবার্তা?

না না। এখানে কথা নেই। যে যার নিজের মতো থাকে। সব চুপ। কথা নেই, গান নেই, হাসি নেই, কান্না নেই। ভোর হয় না। সন্ধে হয় না। বাতাস নেই, বৃষ্টি নেই।

আশ্চর্য! এর তবে মানে কী?

কোনও মানেই নেই এর।

তোমরা কীসের অপেক্ষা করো ওখানে?

কেউ জানে না।

কী করে সময় কাটে? ঘুমোও?

দূর! এখানে ঘুম নেই, জাগা নেই। শোওয়া বসা কিছু নেই। শুধু থাকা।

একেই গোধূলি বলে?

জায়গার কোনও নামও নেই। আমি বলি গোধূলি।

বেশ নাম। গোধূলি। আমিও কি একদিন ওখানেই যাবো?

তা কে জানে? কে কোথায় যায় তা তো জানি না। আমি এখানে আছি, এইটুকু জানি।

তার বউ সুস্মিতা অতঃপর হাতের ভর দিয়ে তার গোধূলিতে উঠে গেল। চিন্তিতভাবে চেয়ে বটু দেখল, গোধূলি নামক মেঘখণ্ড বা কুয়াশার ঘেরাটোপটি শূন্যে মিলিয়ে গেল। অর্থহীন ওই গোধূলি কি পরলোক?

বস্তুত পরলোক নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি বটু। দরকারও পড়েনি। সে ভগবান টগবান নিয়ে চিন্তাই করেনি কখনও। সে

নাস্তিক কি না তাও তার ভেবে দেখার সময় হয়নি কখনও।

কিন্তু গোধূলির ব্যাপারটা তার মাথায় ঘুরছে সেই থেকে। এই যা চারদিকে দেখা যাচ্ছে। এই বাস্তবসম্মত পৃথিবী, এ ছাড়াও কি কিছু আছে আর? এটা সে বুঝতে পারে, সুস্মিতাকে সে আসলে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পলকা এক স্বপ্নেই দেখেছে। কিন্তু স্বপ্নে কি মাঝে মাঝে কিছু বিষয় ফুটে ওঠে?

বোধহয় বটুর এবার একটা চাকরিটাকরি করা উচিত। মিলিটারিতে বড্ড তাড়াতাড়ি রিটায়ার করিয়ে দেয়। প্রান্ত যৌবনেই। তারপর অবশ্য এক্স সারভিসম্যান হিসেবে চাকরিবাকরির সুবিধে আছে। ব্যবসা করতে চাইলেও নানা অগ্রাধিকার পাওয়া যায়। বটু একটা সিকিউরিটি এজেন্সি খুলেছিল। বাড়ি বা অফিস পাহারা দেওয়ার কাজ। কয়েকজনকে চাকরিও দিয়েছিল। কিন্তু বছরখানেকের বেশি চালাতে পারেনি। ইচ্ছেই হল না আর চালিয়ে যেতে। এখন কি আবার কিছু শুরু করবে? করাই উচিত, তা না হলে এই সব ফালতু চিন্তা এসে মাথায় ভূতের বাসা করবে।

আজকাল ঘুমের কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় ডাক্তার তাকে কামপোজ খেতে বলেছে। কিন্তু এসব ওষুধ তার খেতে ইচ্ছে হয় না। তার বাবা অনুরূপ একটি ওষুধ দীর্ঘকাল খেয়েছিল। শেষ বয়সে যখন ইউরিমিয়া হল তখন ডাক্তার ওষুধটা বন্ধ করে দিল, পাছে কোমা হয়। কিন্তু তখন দেখা দিয়েছিল উইথড্রয়াল সিমটম। সেটা বড় কষ্টের।

মিলিটারিতে থাকা সত্ত্বেও বটুর নেশা কিছু নেই। মদটদ খেয়েছে, কিন্তু অল্পস্বল্প। মদটা ঠিক তার সহ্য হত না। পেটে ব্যথা হত খেলেই। সিগারেট ধরেইনি কখনও। কাজেই ট্র্যাংকুইলাইজারের নেশাটাও আর করতে চায় না।

কিন্তু ঘুমটা সমস্যার সৃষ্টি করছে মাঝে মাঝে। এমন নয় যে, তার কোনও দুশ্চিন্তা আছে বা উদ্বেগ। ঠিক তিন মাস আগে স্ত্রী সুস্মিতা মারা যাওয়ায় সাংসারিক সমস্যা টমস্যা সব উধাও হল। অর্থাৎ বটুকে আর কিছু নিয়েই মাথা ঘামাতে হয় না। মিলিটারিতে থাকাকালীন সে বিস্তর টাকা রোজগার করেছে।

সুস্মিতার অসুখে দু হাতে খরচ করতে হয়েছিল তাকে, মুম্বই টাটা হাসপাতাল, কেমোথেরাপি, রেডিয়েশন যা যা করতে বলেছিল ডাক্তার। কলকাতায় বিবেকানন্দ পার্কের কাছে চারতলার এই ফ্ল্যাট কেনা, দেরাদুন থেকে পুণে থেকে অবধি ছোট ছেলের খরচ সামলানো— এ সবের পরও তার বিস্তর টাকা অবশিষ্ট আছে। বড় ছেলে আই. পি. এস, ছোটজন কমিশনড অফিসার। নাঃ, তার কোনও উদ্বেগ নেই। তবু ঘুমটা কেন হয় না! জগিং কি বাড়িয়ে দেবে?

পত্নীশোক বলেও খুব গভীর কিছু নেই বটুর। সুস্মিতা বছরখানেক ভুগেছে। ওই রোগভোগের সময় তার মৃত্যুজনিত পরিস্থিতির জন্য তৈরি হয়েছিল বটু। সাজু আর রাজুও। তারা দুঃখ পেলেও কারও ভিতরে তেমন ভাঙচুর হয়নি। সুস্মিতার একজিটটা তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছিল তারা। অত কষ্টের চেয়ে বরং মৃত্যু ভাল।

বটু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দেখছিল। সামনে একটা রাস্তা, তার ওপাশে বাড়ি। দেখার কিছুই নেই। বটু কখনও সখনও চেয়ে থাকে বটে। কিন্তু কিছুই দেখে না।

পরশুদিন সে এই কথাটাই খাওয়ার টেবিলে বলে ফেলেছিল। তখন সাজু একটা কাঁকরার টুকরো মুখে দিতে যাচ্ছিল, আর তখনই বটু বলে ফেলেছিল, চেয়ে থাকা যায়, দেখা যায় না।

কথাটা কি অর্থহীন? না, তা নয়, হয়তো সাজুর কাছে অপ্রাসঙ্গিক। কেননা সে পূর্বাপর জানে না কোন সূত্রে এই কথাটা বেরিয়ে আসছে।

এই লিকেজগুলোকে ভয় পাচ্ছে আজ বটু, এই লুজনেসটা পাগলামোর লক্ষণ হওয়া বিচিত্র নয়।

রাত দশটা, হলঘরে টেলিফোন বাজল। প্রথমে পিঙ্কি ধরল। তারপর সাজু। পুলিশ অফিসার সাজু কারও সঙ্গে কথা বলছে। বটুর ফোন আসেই না প্রায়, তাকে কারোরই আর প্রয়োজন নেই, দোষটা অবশ্য তারই, কলকাতা ভরা তাদের বিস্তর আত্মীয়স্বজন কিন্তু কারও সঙ্গেই বটু কখনও যোগাযোগ

রাখেনি। এমনকী বিজয়া বা নববর্ষে কাউকে একটা পোস্টকার্ডও লেখেনি, মিলিটারিতে চাকরি করত বলে তার ঠিকানাটাই ছিল সাংকেতিক, তাতে জায়গা বা ডাকঘরের নাম থাকত না, শুধু নম্বর থাকত, মিলিটারি হেড কোয়ার্টার থেকে কোড ডিসাইফার করে সেনসরশিপের পর চিঠি হাতে আসত। সেই ঠিকানাও কাউকে জানায়নি বলে আত্মীয় স্বজনের বিয়ে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানের নেমন্তন্ন পেত না সে। বিপদ হল, সাজুর বিয়ের সময়, তখন আত্মীয়দের না ডাকলেই নয়, বাধ্য হয়ে গাড়ি ভাড়া করে পুরানো সব আত্মীয়দের ঠিকানা খুঁজে খুঁজে যেতে হল, আর তখনই আবিষ্কৃত হল তার অনেক আপনজনই নেই। ছোট কাকা, বড় জ্যাঠতুতো ভাই, এক মামা, এক মাসি, পুরোনো বন্ধুদের মধ্যেও দু একজন গত হয়েছে, আত্মীয়দের কেউ কেউ তাকে ভালভাবেই গ্রহণ করল, কেউ কেউ ঈষদুষ্ণ বা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা ব্যবহার করেছিল। বিয়েতে তারা এল সাকুল্যে মাত্র জনা সাতেক, বন্ধু বান্ধবও তথৈবচ, ক্যাটারারের একগাদা খাবার নষ্ট হল।

এই যোগাযোগহীনতা আবার অতিক্রম করার চেষ্টা করা উচিত হবে কি? এতকালের উপেক্ষা কি তারা সহজে ভুলে যাবে? চেষ্টাটা তাই আর করেনি সে। কাজেই তাকে কেউ ফোন করে না, ডাকে না বা আসেও না, তাতে বটুর অসুবিধে কিছু নেই। মানুষ নানা ভাবেই বেঁচে থাকে।

দরজায় টোকা দিয়ে পিঙ্কি বলল, আপনার ফোন বাবা।

একটু অবাক হল বটু, রাত দশটায় কে আবার ফোন করে তাকে? গিয়ে ফোনটা ধরল।

হ্যালো।

একটা ভারী নরম ও ভদ্র নারীকণ্ঠ বলল, নমস্কার, আমার নাম অপরাজিতা। আমি সুস্মিতার বান্ধবী।

ও, ও তো—

জানি, ও আমাকে চিঠিতে ওর অসুখের কথা জানিয়েছিল। আমি তো ওর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, এতদিন আমি ইংল্যান্ডে ছিলাম। সবে এসেছি, এসেই খবরটা পেলাম ওর

শ্রাদ্ধের চিঠিটা দেখে, বড্ড স্যাড।

হ্যাঁ, কিন্তু কী আর করা যাবে।

সেই তো, সবাইকেই এরকম একে একে চলে যেতে হবে। আপনি কেমন আছেন বলুন।

আছি।

খুব একা হয়ে গেছেন তো! বয়সকালে বউ না থাকলে পুরুষেরা বড্ড হেলপ্‌লেস হয়ে পড়ে।

তা খানিকটা ঠিক।

আপনি আমাকে চিনতে পারছেন কি?

হুঁ, মানে—আপনার কথা শুনেছি ওর কাছে।

আপনি আমাকে দেখেওছেন, বছর বারো আগে আপনি নর্থ ইন্ডিয়া থেকে নর্থ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ারে বদলি হয়ে যাওয়ার পথে দমদমের বাড়িতে কয়েকদিনের জন্য হল্ট করেছিলেন, সেই সময় আমিও দেড় মাসের ছুটিতে কলকাতায় এসেছিলাম। সুস্মিতা বিভিন্ন বন্ধুকে ফোন করে খবর নিচ্ছিল, আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যায়। তখন আমি একদিন সকালে গিয়ে সন্ধে অবধি আপনাদের বাড়িতে কাটিয়ে আসি। আপনার সঙ্গেও অনেকক্ষণ আড্ডা হয়, মনে পড়েছে কি?

বটুর স্মৃতিতে একটা উদ্ভাস ঘটে গেল, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, বারো বছর আগে উত্তর তিরিশের সেই ভদ্রমহিলাকে মনে না পড়াটাই অস্বাভাবিক।

বটুর গলায় একটু প্রাণের সঞ্চার ঘটল, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে, কী আশ্চর্য!

মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে পড়ছে।

আমার মুখটা গোল বসে আপনি আমার নাম দিয়েছিলেন টমেটো।

বটু একটু হেসে বলে, শুধু গোল বলেই নয়, গোলাপি বলেও।

বলেই সে টক করে ফিরে দেখে নিল, সাজু বা পিঙ্কি ধারে কাছে আছে কি না, লজ্জার কথা, সাজু না থাকলেও পিঙ্কি

খাওয়ার টেবিলে বসে স্যুপ-টুপ জাতীয় কিছু খেতে খেতে তার দিকে খুব কৌতুহল নিয়ে চেয়ে আছে।

ফোনে অপরাজিতার হাসি শোনা যাচ্ছিল, বলল, সেই চেহারাটা আর নেই, বয়সও তো হচ্ছে।

ইংল্যান্ড থেকে চলে এলেন নাকি?

আসারই তো প্ল্যান ছিল, ওখানে এথনিক প্রবলেমটা তো বাড়ছে, সবসময়ে টেনশন, চলে আসব বলে এখানে বাড়িটা রিনোভেটও করিয়েছি অনেক খরচ করে। কিন্তু ছেলে-মেয়ে আসতে চায় না। ওরা ওখানকার কালচারে মানুষ তো।

সেটাই তো স্বাভাবিক।

হ্যাঁ, তা ছাড়া এখানে এত পলিউসান, জল এত খারাপ যে ওরা এলেই ভোগে। সর্দি-কাশি , আমাশা, ওরা আসতে না চাইলে আমরা স্বামী-স্ত্রী এসে কী করব বলুন!

সেটাও তো ঠিক কথা, এন আর আইদের সকলেরই তো এইরকম অবস্থা।

হ্যাঁ, একদিন আসুন না আমাদের বাড়িতে, কাছেই তো!

কোথায় যেন?

চারুচন্দ্র প্লেস, চারু মার্কেটের উল্টো দিকের রাস্তা। ফোন নম্বরটা লিখে নিন।

বটু লিখে নিল।

কবে আসবেন।

দেখি।

দেখি-টেখি নয়, এখন তো আপনার হাতে অনেক সময়, চাকরি-টাকরি কিছু করছেন নাকি? আর্মির লোকেরা শুনেছি—

না, আমি চাকরি করি না।

তা হলে তো আসতেই পারবেন। ছেলেরা কী করছে?

একজন আই পি এস. চব্বিশ পরগনায় পোস্টিং, ছোটটা পুণেতে মিলিটারি একাডেমি।

বড় জনের তো বিয়ে দিয়েছেন, সুস্মিতা আমাকে কার্ড পাঠিয়েছিল। বউ কেমন হল?

ভাল।

ভাল না হলে চলবে কেন? এখন আপনাকে দেখাশোনা করার জন্য তো একজন লোক দরকার।

না না। আমি নিজেই নিজের দেখাশোনা করতে পারি, কারও সাহায্যের দরকার হয় না।

অপরাজিতা হাসছিল, সব পুরুষেরই কেন যে এত হামবড়াই থাকে, আপনারা কি চিরতরুণ? আমার কর্তাটিকেও তো সবসময়েই বলতে শুনি আই অ্যাম এ সেলফ্‌মেড ম্যান, কারও হেলপ দরকার নেই, অথচ প্রতি পদেই অপুকে দরকার হয়, কেবল অপু আর অপু।

অপু কে?

আমিই তো ওঁর অপু, অপরাজিতার অ্যাব্রিভিয়েশন।

ওঃ হ্যাঁ, তাই তো।

নিন আমার কর্তার সঙ্গে একটু কথা বলুন।

একটা ভারী পুরুষালি গলা বলল, গুড ইভনিং কর্নেল রায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ইভনিং।

অপু আপনার কথা আজ বলছিল খুব, বলছিল, আপনি নিশ্চয়ই এখন লোনলি অ্যান্ড ডিজেক্টেড ফিল করছেন, আমি অপুকে বললাম, মিলিটারিম্যানরা অত সহজে কাবু হয় না। দে আর মেড অফ স্টার্নার স্টাফ, কী বলেন? অবশ্য ভ্যাকুয়াম একটা তো হয়ই।

হ্যাঁ।

তা কবে আসছেন? ক্যান ইউ মেক ইট টুমরো ইন দি ইভনিং?

দেখছি, কাল না হলেও এই উইকে একদিন হতে পারে, আমি ফোন করে জানাবো।

ও কে, দ্যাটস ফাইন।

অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর কলিং।

ফোনটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল, যন্ত্রটা রেখে ফের তাকাল বটু, পিঙ্কি ধীরে ধীরে স্যুপ খাচ্ছে, বোধহয় স্বাস্থের নিয়মানুসারে ওই ভাবেই খেতে হয়, স্যালিভা মিশিয়ে, মেয়েটা শরীর ছাড়া কিছু বোঝে না।

বটু ঘরে এসে দরজা দিয়ে বাথরুমে গেল, ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। ঠিক পাঁচ মিনিট অপরাজিতার কথা ভাবল। বারো বছর আগে সুস্মিতার এই বান্ধবীটির চেহারা তাকে মুগ্ধ করেছিল। খুব ঢলঢলে হাসিখুশি চেহারা, আর অপরাজিতা বেশ কয়েকবার তার মুগ্ধ ও প্রশংসাময় কটাক্ষ উপহার দিয়েছিল বটুকে। ভাগ্যিস, দেখাশোনাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি, ওই একদিনের দেখা সাক্ষাতেই তুফান লেগেছিল বোধ হয় দুই তরণীতেই।

কত কালের কথা!

পায়ের দিকে দেয়ালে একটা উঁচু অল পারপাস ক্যাবিনেট, কালো রং করিয়েছিল সুস্মিতা। কিংবা কে জানে আবলুশ কাঠও হতে পারে। ওই ক্যাবিনেটের মাথার দিকে চেয়ে বটু ভাবছিল, একটু দূরেই, হয়তো সামান্য ওপরের দিকে কোথাও একটা গোধূলি রয়েছে।

আছে, কোথাও কিছু আছে, সব শেষ হয় না, হয়তো বাস্তবে থাকে না, গোধূলিতে মিলিয়ে যায়।

আজ গোধূলিই ঘুম পাড়াল তাকে।

সকালে জগিং-এর সময় বটু রোজ টের পায়, ঠিক আছে, এখনও সে ঠিক আছে, স্পিড, দম, কোনওটারই ঘাটতি হচ্ছে না। স্কিপিং করার সময় সে লক্ষ রাখে হাঁটুতে বাতজনিত কোনও ব্যথাটাথার সূচনা হচ্ছে কি না, না, এখনও এই চুয়ান্ন প্লাস বয়সে তার শরীর বেশ ছম ছম করছে, চর্বি ছিল না কখনও, আজও নেই, ঝরঝরে একহারা চেহারা, শরীর নিয়ে চিন্তার কারণ এখনও ঘটেনি।

শিমুল বসু তার জন্য রোজই লেক-এর একটা বেঞ্চে জায়গা রাখে, সকালের দিকটায় বেঞ্চে জায়গা পাওয়ার একটু সমস্যা হয় বলে শিমুল বসু একটা খবরের কাগজ বা গায়ের চাদর কিছু ফেলে রাখে, আজ ছিল একটা বই।

কী বই মশাই?

শিমুল বইটা তুলে শান্তিনিকেতনি ঝোলায় পুরতে পুরতে বলল, ডেল কার্নেগির। বাড়িতে অশান্তি যাচ্ছে।

ডেল কার্নেগি পড়ে কাজ হচ্ছে?

বইতে ভাল ভাল কথাই তো সব লেখে, সব কি আর ফলো করা যায়? তবে একটা মেন্টাল একসারসাইজ হয়। আত্মরক্ষার চেষ্টা বলতে পারেন।

বটু হাসল, কাজ হলে তো ভালই।

আপনার তো ঝঞ্ঝাট মিটেই গেছে।

তাই নাকি?

নয়? গিন্নি পগার পার হয়েছেন, আর ঝঞ্ঝাট কীসের? বউরাই তো সংসারের নানা ঢাকা চাপা জিনিস খুঁচিয়ে তুলে তুলে গণ্ডগোলটা পাকায়। পুরুষদের নজরে যা পড়ে না, চিন্তায় যা আসে না, কল্পনাও যা করতে পারে না, গিন্নিরা সেইসব ব্যাপার পুরুষদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, চিন্তায় ঢুকিয়ে দেয়, কল্পনায় আনতে সাহায্য করে। আর স্বামীকে যে তারা কী চোখে দেখে তা আর বলার নয়।

হ্যাঁ হ্যাঁ তা বটে।

আপনি অবশ্য মিলিটারি ম্যান, জানি না আপনার ফ্যামিলি লাইফ কীরকম ছিল, তবে ঝাঁঝালো পুরুষদের কাছে গিন্নিরা টিট থাকে।

নিজের বউ সুস্মিতা সম্পর্কে বটুর তিক্ত বা মধুর কোনও মনোভাবই নেই, সুস্মিতাকে যতটুকু চেনে বটু তাতে তার অ্যাসেসমেন্ট, সুস্মিতা খুব ক্যারিয়ার সচেতন ছিল। বটুর র‍্যাংক নিয়ে ভাবত, মাথাও ঘামাত। নিজের ছেলেদের ব্যাপারেও সে ছিল ভীষণ রকমের কঠোর। পড়াশুনোয় ফাঁকি দিতে দেয়নি কখনও, বলতে গেলে সুস্মিতার জন্যই সাজু বরাবর ভাল রেজাল্ট করেছে, একবারে আই পি এস-এও সিলেকশন পেয়েছে। ছোটটাকে দুন মিলিটারি স্কুলে পাঠাতেও সুস্মিতার কোনও সেন্টিমেন্ট বাধা হয়নি, বরং বটুর একটু হয়েছিল। বটু বলেছিল, আবার মিলিটারিতে কেন? জবাবে সুস্মিতা বলেছিল আমি চাই ও ভারতবর্ষের জেনারেল হোক।

সুস্মিতার এইসব উচ্চাকাঙ্ক্ষাই বোধহয় তাকে সর্বদা ব্যস্ত রাখত। তা ছাড়া মিলিটারিদের বিশেষ পরিবেশে সাংসারিক খুঁটিনাটিও মাথা চাড়া দেয়নি কখনও।

শিমুল বসুর দিকে চেয়ে সে বলল, ঝাঁঝাঁলো মানে কি স্পিরিটেড?

হ্যাঁ। তেজী, ব্যক্তিত্ববান পুরুষ।

মিলিটারিতে থাকলেই যে মানুষ তেজী আর ব্যক্তিত্ববান হবে তা নয়, মিলিটারিতে রুটিন আর ডিসিপ্লিনে থাকতে হয়। তাতে মানুষ একটু যান্ত্রিক হয়ে যায়। আবেগ টাবেগ কম হয়।

মায়া বোঝেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মায়া-মমতা বুঝব না কেন?

মিলিটারিদের বুঝবার কথা নয়। এই আমরা—যারা গড়পরতা বাঙালি তাদের কুরে খাচ্ছে এই মায়া-মমতা, মোস্ট ফালতু জিনিস, দুনিয়াতে কে কার বলুন। তবু ওই মায়া আর মমতাই আমাদের খায়। ছোট ছেলের স্কুটার কেনার বাই চেপেছে, দু' চাকার পলকা জিনিস, কলকাতার বিপজ্জনক রাস্তায় ও জিনিস চালানোর রিস্ক ভাবুন, কিন্তু কিনে না দিলে মুখ ভার করে থাকবে, কথাটথা কইবে না, কাছে ঘেঁষবে না, বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াবে, বাপের তখন মায়া হবেই, কিনেও দেবে। আর তারপর সারা দিন বাপের বুক ধড়ফড় করবে, এই বুঝি পড়ল, এই বুঝি মরল। কিনে না দেওয়ার মতো শক্তও হতে পারি না, আবার কিনে দেওয়ার পরও শক্ত থাকতে পারি না, কী দোটানা বলুন তো!

তাই ডেল কার্নেগি পড়ছেন? ছোট ছেলে স্কুটার কিনল বলে?

ঘটনা তো একটা নয়, ঘটনার পর ঘটনা, মেয়েকে যদি বলি ওই ছেলেটার সঙ্গে মিশবে না, বউকে যদি বলি ওই শাড়িটা কিনো না, তারা ধুন্ধুমার বাঁধিয়ে দেবে। অথচ জানি সত্যিকারের গেরামভারী পুরুষ মানুষের রক্ত-জল-করা চাউনি আছে, গম্ভীর কর্তৃত্বময় ব্যক্তিত্ব আছে, তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওরা সাহসই পেত না কিছু করার। কিন্তু পুরুষকারটাই যে নেই মশাই, অধিকাংশ বাঙালি পুরুষেরই দেখবেন সংসারে লেজেগোবরে অবস্থা, বউ মানে না, ছেলেপুলেরা মানে না, তাদের হুমকিতে বাড়ির বেড়ালটা অবধি ডরায় না, তাই

বলছিলাম বাঙালিদের এখন দলে দলে মিলিটারিতে যাওয়া উচিত, ওইসব মায়া মমতা, ফালতু সেন্টিমেন্ট ঝেড়ে ফেলে আসুক , বাঙালির বীরত্ব কোথায় এসে ঠেকেছে জানেন? পাড়ায় পাড়ায় রক্তদান শিবির করা ছাড়া আজকাল আর বাঙালির বীরত্ব বলে কিছু নেই।

বটু নিজের কথা একটু ভাবল, সংসারে সেও কি মান্যগণ্য? তাকে কি যথেষ্ট সমীহ করা হচ্ছে? বোধহয় জবাবটা নেতিবাচকই হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, উপেক্ষার জবাব সেও উপেক্ষা দিয়ে দিতে পারে। আজও সামরিক প্রশিক্ষণের ওই সুফলটুকু হয়তো আছে তার।

পিছন দিয়ে একটা লম্বা ফর্সা ছেলে দৌড়ে যাচ্ছিল। গতি কমিয়ে হাসিমুখে বলল, হাই কাকু।

বটু হাত তুলে বলল, আজ দেরি যে!

কাল একটু লেট নাইট করেছিলাম। উঠতে তাই দেরি হল।

ও।

আপনার হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

আজ ক রাউন্ড?

দি ইউজুয়াল, তিন।

দ্যাটস গুড,

ছেলেটা হরিণের মতো দৌড়ে চলে গেল। দীপু মানে সুদীপ্ত ব্যানার্জি, ছেলেটার সঙ্গে এখানেই পরিচয়, ক্রিকেট আর ট্রেকিং ওর নেশা।

শিমুল বসু আজ কিছু চিন্তিত। উদ্বিগ্ন।

বটু বলল, স্কুটারটা কি কেনা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, দিনরাত দাবড়ে বেড়াচ্ছে, দুশ্চিন্তায় আমার প্যালপিটিশন হয় সবসময়।

স্পিড কন্ট্রোল করে চালালে ভয় কী? কেউ তো আর ইচ্ছে করে অ্যাকসিডেন্ট করে না।

কলকাতা সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা নেই, এখানে স্পিড আপনার ওপর নির্ভর করে না, আপনার পিছনের গাড়িটা কত

স্পিডে আসছে তার ওপর নির্ভর করে। অনেক সময়ে ইচ্ছে না থাকলেও বাধ্য হয়ে স্পিড দিতে হয়। আর তখনই বাইকের ওপর আপনার কন্ট্রোল নেমে আসে জিরোতে।

আপনি চালাতেন বুঝি?

দীর্ঘদিন। তখন গাড়িটারি কিন্তু কম ছিল। আর এখনকার ইয়ং ছেলেরা একদম রেকলেস,

যৌবন মানেই তো একটু রেকলেসনেস।

তাও বটে, কিন্তু...

ভাবুন তো যে সব ছেলে ফাইটার প্লেন চালায় তাদের মা বাবাদের অবস্থা আপনার চেয়েও কতটা খারাপ?

আরে মশাই সেই কথাই তো বলছি, ইয়ং ছেলেরা স্কুটার চালাবে, যুদ্ধ বিমান চালাবে, পাহাড়ে উঠবে, স্কাই জাম্পিং করবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা হল আমাদের উদ্বেগটা নিয়ে, এই টেনশনটা কাটাতেই আমাদের মিলিটারিতে ঘুরে আসা উচিত ছিল।

সেটা হয়নি বলেই বিকল্প হিসেবে ডেল কার্নেগি ধরলেন?

টেনশনের একটা অ্যান্টিডোট তো দরকার।

সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ যখন বটু ফেরে তখন সাজু তৈরি হচ্ছে বেরোনার জন্য, পিঙ্কি বারান্দায় তার স্ট্যাটিক সাইকেলে ব্যায়াম করছে। ঘর ভর্তি টোস্ট আর ওমলেটের গন্ধ।

সকালে জগিঙের পর বটুর একটা পাগলাটে খিদে পায়। সুলক্ষণ সন্দেহ নেই। কিন্তু এই খিদেটা বিপজ্জনকও, কারণ গোগ্রাসে বাছবিচার করে না খেলে খাবারটা ভিতরে গিয়ে ফ্যাট ও অন্যান্য জটিলতা তৈরি করবে।

শীত সবে পড়তে শুরু করেছে। দিনের বেলা এখনও কলকাতায় গরম, রাতের দিকে সামান্য হিমেল ভাব। স্নান করতে গিয়ে আজ একটু গা শিরশির করল। হলঘরে মিক্সি চলার আওয়াজ হচ্ছে, গাজর বিট শসা আরও কী কী যেন মিশিয়ে একটা ক্বাথ তৈরি হয় এবং সেই অখাদ্য জিনিস পিঙ্কি খায়। এইসব অখাদ্য খেয়েই সে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। অত

ব্যায়াম করলে ফ্যাটের ভয় কী? যা খুশি খেতে পারে। কিন্তু পিঙ্কি খাবে না। মাংস বা মাছ ও খায় সেদ্ধ করে।

বটু যখন খাবার টেবিলে সকালের জলখাবার খেতে আসে তখন সকাল ন'টা বা সোয়া ন'টা। সাজু পোশাক পরছে। গেঞ্জি আর চাপা জিনস পরা পিঙ্কি কাঁধে একটা তোয়ালে ফেলে টেবিলের উল্টো দিকে বসে তার ক্বাথটি খায় এ সময়ে। আজও খাচ্ছিল।

বটুকে দেখে বলল, ওই ভদ্রমহিলা ফোন করেছিলেন।

কে?

সেই যে কালকের মহিলা।

ও, কী বলল?

ফের ফোন করবেন।

আচ্ছা।

পিঙ্কি তার সব্জির রস খেতে খেতে গেলাসের ওপর দিয়ে দুটো কৌতূহলী চোখে বটুকে দেখছিল, বাচ্চা মেয়ে, জানার ইচ্ছে প্রবল। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, ভদ্রমহিলা কে?

বটু ডিম আর টোস্ট খেতে খেতে বলল, তোমার শাশুড়ির বান্ধবী, বিলেতে থাকে।

মনে মনে বটু একটু হাসল। পিঙ্কি বোধহয় ফস্টিনস্টির গন্ধ পাচ্ছে।

একদিন আসতে বলুন না।

বটু অবাক হয়ে বলল, আসতে বলব?

আপনি তো একা একাই থাকেন। একজন কম্প্যানিয়ন হবে।

কথাটা ভাল শোনাল না বটুর কানে। ও বলতে চাইছে কী? বটু মাথা নিচু করে খুব স্বাভাবিকভাবে খেতে খেতে অতিশয় আলগা গলায় বলল, তোমার শাশুড়িই বেঁচে নেই, এসে করবে কী?

সব্জির জুসটা শেষ করে পিঙ্কি বলল, আমি কিন্তু আসতে বলেছি। উনি বলেছেন আসবেন।

বটু সামান্য হেসে বলল, তাই নাকি? বেশ তো।

খাওয়া শেষ করে বটু ঘরে এসে পত্রিকাটা নিয়ে যখন সবে

বসেছে, তখনই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটল। ঘরের দরজা সবসময় ভেজানো থাকে বলে প্রথমটায় একটা শিস দেওয়ার মতো শব্দ শুনেও গা করেনি বটু। ভেবেছিল প্রেসার কুকারের আওয়াজ।

প্রথম চিৎকারটা করল ধরম, গ্যাস লিক করেছে। গ্যাস লিক করেছে। পালান।

তারপরই পিঙ্কির চিৎকার শোনা গেল, মাগো! বাড়ি উড়ে যাবে যে ! সর্বনাশ—

দুরদার দৌড়োদৌড়ির শব্দ দাপিয়ে স্টিম ইঞ্জিনের হুইশিলের মতো তীব্র ভয়ংকর একটা শব্দের সঙ্গে সমস্ত ফ্ল্যাটটা যেন থরথর করে কাঁপছিল।

সাজুর গলা উঠল সবাইকে ছাপিয়ে, গেট আউট এভরিবডি। এখনই আগুন লাগবে। ওফ, এ কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!

দৌড়ে সবাই বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বোধহয়। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল।

বটু উঠল। দরজা খুলে ধীর পায়ে বেরিয়ে আসতেই তীব্র গ্যাসের গন্ধ এসে ধাক্কা মারল নাকে। রান্নাঘরটা ধোঁয়াক্কার। তীব্র গতিতে সিলিন্ডারের মুখ দিয়ে গ্যাস বেরিয়ে সিলিংয়ে গিয়ে লাগছে। তার প্রবল ধাক্কায় বাড়ি কাঁপছে।

বটু রান্নাঘরে ঢুকল। সিলিন্ডারের সঙ্গে সুতোয় ঝোলানো ক্যাপটা তুলে মুখটা চেপে বন্ধ করার চেষ্টা করল। কিন্তু এত জোরে গ্যাস বেরিয়ে আসছে যে, দুবারে পারল না। তৃতীয়বারে জোর করে বসিয়ে দিল ক্যাপটা তারপর বাইরের দিককার জানালাগুলো ভাল করে খুলে দিল।

সমস্ত শরীর গ্যাসে ভিজে সপসপ করছে। পা থেকে মাথার চুল অবধি। এই অবস্থায় যদি আগুন লেগে যায় তা হলে আর তার জন্য ঘাট খরচের দরকার হবে না।

বটু একটু হেসে বাথরুমে গিয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে গা মুছে নিল। সিলিন্ডারটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় রাখল। রিজার্ভ সিলিন্ডারটা নিয়ে এসে রেগুলেটর লাগিয়ে দিল।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে সে যখন বুঝল যে, ঘরে আর

গ্যাস নেই, তখন বার্নারটা জ্বেলে দেখল, সিলিন্ডারটা ঠিক আছে কি না। আছে। গ্যাসটা আবার নিবিয়ে দিল সে।

টুং করে ডোরবেল বাজতেই বটু গিয়ে দরজা খুলল। বাইরে রাজ্যের ভয় আর বিস্ময় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধরম, পিঙ্কি, সাজু এবং তাদের পিছনে অন্যান্য ফ্ল্যাটের বিস্তর লোক।

বটু ভ্রূ তুলে ভিড়টাকে দেখে বরাভয়ের গলায় বলল, ভয় নেই। তোমরা ভিতরে এসো।

সাজুর পোশাক পরা হলেও এক পায়ে মোজা অন্য পা খালি। তাড়াহুড়োয় দ্বিতীয় মোজাটা পরার সময় পায়নি। পিঙ্কির হাতে একটা স্যুটকেস। বোধহয় নিজস্ব জিনিসপত্র আগুনের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল।

সাজু একটু বিরক্ত গলায় বলল, কী করছিলে! বেরিয়ে এলে না যে!

বটু ছেলের দিকে চেয়ে বলল, বেরোনোর মতো কিছু হয়নি।

ধরম ঘরে ঢোকার আগে বাতাস শুঁকছিল, বটু তাকে বলল, সিলিন্ডার পাল্টে দিয়েছি। আগেরটা ডিফেক্টিভ ছিল। গ্যাসের দোকানে ফোন করে ওটা পাল্টে দিয়ে যেতে বোলো।

ওদের পিছু পিছু এক গাদা লোক ঘরে ঢুকল। কে একজন তাকে বলল, রামরাম বাবুজি।

বটু জানে এখন এই ঘটনাটা নিয়ে বিস্তর কথা হবে। অনেক সওয়াল জবাব, ব্যাখ্যা। সে এসবের মধ্যে থাকতে চায় না। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে খবরের কাগজ খুলে জানালার কাছে বসল সে। ঘরে বসেই সে ডাইনিং হল-এ উত্তেজিত আলোচনা শুনতে পাচ্ছিল।

কোনও এক প্রতিবেশী বলল, আপনারা বাবুজীকে ছোড়িয়ে চলিয়ে গেলেন, কিন্তু বাবুজী তো ভাগলেননা।

ইয়াঃ, হি ইজ এ কারেজিয়াস ম্যান। যা শব্দ হচ্ছিল আমরাই তো ওপরের ফ্ল্যাট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম ভয়ে।

একটা মেয়ে বলল, বাপ রে, গোটা বাড়িতেই আগুন লেগে যেত আজ। আমার তো হার্টবিট বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

হ্যাঁ, সব ফ্ল্যাটেই সিলিণ্ডার আছে, সবগুলোই ফাটত। উনি

সাহস করে না এগোলে—

আরে হবে না কেন, হি ওয়াজ এ মিলিটারি ম্যান।

গ্যাসের দোকানে ফোন করছিল পিঙ্কি। উত্তেজিত গলায় বলছিল, কী হত আজ বলুন তো! আমাদের ফ্ল্যাটটা পুড়ে গেলে আপনারা কমপেনসেশন দিতেন? ...ডিফেকটিভ সিলিণ্ডার টেস্ট করে দেন না কেন?... আমার হাজব্যাণ্ড আই পি এস অফিসার, আমরা পুলিশ অ্যাকশন নিতে পারি তা জানেন?... ইত্যাদি।

বটু খেলার পাতাটা উল্টে দেখতে লাগল। ক্রিকেট আর টেনিস তার প্রিয় খেলা।

মিনিট পনেরো বাদে হলঘরের কোলাহল বন্ধ হল। বাইরের দরজা লক করার শব্দ হল। আরও দশ মিনিট বাদে ডোর বেল বাজল। এল গ্যাসের দোকানের লোকেরা।

একটা লোক বলল, ওঃ, খুব বেঁচে গেছেন আপনারা। সিলিন্ডারটা এখনও থ্রি ফোর্থ ভর্তি আছে।

পিঙ্কির গলা শোনা গেল, আমার শ্বশুরমশাই না থাকলে কী হত বলুন তো! কেন আপনারা টেস্ট করে দেন না?

কী করব বউদি, সিঙ্গল সিলিন্ডার হলে আমাদের লোক লাগানোর সময় টেস্ট করে লাগিয়ে দিয়ে যায়। ডাবল সিলিন্ডারে তো তা হয় না। আর আমাদের গো-ডাউনে শয়ে শয়ে সিলিন্ডার, সব কি টেস্ট করা সম্ভব বলুন! আর যদি সিল খুলে টেস্ট করি তখন কাস্টমররা সন্দেহ করবে গ্যাস চুরি করেছি বলে। ....

সিলিন্ডার নিয়ে ওরা চলে যাওয়ার পর ফের ডোর বেল বাজল। কে যেন এল। ফের চলেও গেল। সাজু পিঙ্কিকে বলে গেল, আমি যাচ্ছি। আমার আজ দেরি হয়ে গেল।

সাজু চলে যাওয়ারও কিছুক্ষণ পর দরজায় নক করল পিঙ্কি, বাবা! আপনি কি ঘুমোচ্ছেন?

না।

বটু উঠে দরজা খুলল।

কিছু বলবে?

চোখ গোল গোল করে মেয়েটা তাকে দেখছিল। মুখটা করুণ করে বলল, আই অ্যাম সরি, আপনাকে ঘরে রেখে আমরা পালিয়ে গিয়েছিলাম।

বটু শান্ত গলায় বলল, তাতে কিছু অন্যায় করোনি। বিপদে সবাই তাই করে। আর আমিও তো অথর্ব নই, প্রয়োজন হলে বেরিয়ে যেতে পারতাম।

আপনি বেরোলেন না কেন?

দরকার হয়নি বলে।

আগুন লেগে সিলিন্ডার বার্স্ট করলে কী হত? আপনি ভয় পেলেন না!

আরে না। বেশির ভাগ বিপদই ঘটে ঘাবড়ে যাওয়ার ফলে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে লজিক্যাল স্টেপ নিলে অনেক বিপদই কাটিয়ে দেওয়া যায়।

আপনাকে আমার একটুও ভাল লাগে না।

বটু একটু অবাক হল। ঠিক এতটা বলা কি মেয়েটার উচিত হচ্ছে? মুখের ওপর বলছে! কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কীরকম প্রতিক্রিয়া হওয়া দরকার সেটাই বটু ভেবে পেল না। শুধু বলল ও।

আপনি বেরোননি বলে অন্য সব ফ্ল্যাটের লোকেরা আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে কত কথা বলছিল জানেন?

কী বলছিল?

বলছিল, বুড়ো বাপকে বিপদে ফেলে পালিয়ে আসে, এরা কেমন লোক! জয়সোয়ালদের বউটা ভীষণ ঠোঁট কাটা।

লোকের কথায় কান দিও না, তোমরা কিছু ভুল করোনি।

আপনি ঠেকুয়া খাবেন?

বটু এবার আরও একটু অবাক হয়ে বলল, ঠেকুয়া?

হ্যাঁ, জয়সোয়ালজি আপনার জন্যই দিয়ে গেলেন এইমাত্র।

আমার জন্য? হঠাৎ কী ব্যাপার?

হিরো ওয়ারশিপ। খাবেন?

বটুর পিঙ্কি সম্পর্কে তেমন কোনও ধারণা ছিল না এতদিন। এখন মনে হল, মেয়েটা বেশ ঠোঁটকাটা। এসব নিয়েই চলতে

হবে। সে বলল, ঠিক আছে, রেখে দাও। পরে দেখা যাবে।

পিঙ্কি তার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থেকে বলল, আমি একা নই, আপনার আই পি এস ছেলেও কিন্তু পালিয়ে গিয়েছিল এক পায়ে মোজা নিয়ে। অ্যান্ড হি ইজ সাপোজড টু বি এ ম্যান অফ কারেজ।

বটু ভ্রূ কোঁচকালো। লক্ষণটা ভাল নয়। নতুন বিয়ে, এখনই স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্পর্কে অ্যাসেসমেন্টের সময়। পিঙ্কি যদি তার স্বামীকে কাপুরুষ ঠাওরাতে শুরু করে তা হলে ধারণাটা গেড়ে বসবে।

সে গম্ভীর গলায় বলল, সাজু ভিতু ছেলে নয়। তবে গ্যাস লিক সম্পর্কে তার কোনও ধারণা ছিল না বলে হঠাৎ এরকম হওয়ায় সে হয়তো—

গ্যাস লিক সম্পর্কে আপনার কি আগের এক্সপিরিয়েন্স্ আছে?

না, বটুরও অভিজ্ঞতা নেই। সে ধীর গলায় বলল, না। তবে ঘটনাটা সামান্য। গুরুত্ব দিয়ো না।

ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে আমার আজ একটুও ভাল লাগছে না।

বটু কথাটার কোনও জবাব দিল না। এ তো প্রশ্ন নয়, ঘোষণা। সে একটু হাসবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তারপর দরজা থেকে সরে এসে জানালার পাশে চেয়ারে বসে খবরের কাগজ মেলে ধরল চোখের সামনে। বটু বুঝতে পারছে ওরা একটু লজ্জায় পড়েছে, একটু আত্মগ্লানিও হয়েছে, কিন্তু তার কোনও তেমন কারণ নেই।

ফোনটা এল পিঙ্কি বেরিয়ে যাওয়ার পর।

অপরাজিতা বলছি। আপনার টমেটো।

আপনার টমেটো কথাটা খট করে লাগল বটুর কানে। হেসে বলল, হ্যাঁ। সকালে ফোন করেছিলেন তো?

হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি কি এখনও জগিং করেন?

করি।

আমার কর্তা তো আপনারই বয়সী। কিন্তু উনি কিছু করেন

না।

তাতে কী? সকলের কি সবকিছু ভাল লাগে?

শরীর ফিট রাখাটাও তো দরকার, বলুন।

অনেকের কাছে শরীরটা বড় কথা নয়।

আপনার বউমার সঙ্গে আলাপ হল। ভারী ভাল মেয়েটি।

হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল।

অনেক কথা হল আমার সঙ্গে। আমাকে বারবার যেতে বলল আপনাদের বাড়িতে। নিজেও নাকি আসবে।

বেশ তো!

খুব বাচ্চা না?

হ্যাঁ, এই বোধহয় উনিশ টুনিশ।

অল্পবয়সী বউ এনে ভাল করেছেন। আপনাদের মতো করে গড়ে নিতে পারবেন।

বটু হাসল, গড়ার কিছু নেই। আজকাল উনিশেই মেয়েরা খুব ম্যাচিওর করে যায়।

সেটা অবশ্য ঠিক। তবু তো বাঙালি মেয়ে, সহবত শেখাতে হবে না। আমার কপালে কী আছে কে জানে।

অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ না করে বটু চুপ করে রইল।

অপরাজিতা নিজেই বলল, আমার ছেলে তো একটি মেমসাহেবের সঙ্গে ডেটিং করছে।

সেরকমই তো হওয়ার কথা।

সেই তো। মেয়েটা এমনিতে ভাল, কিন্তু বাঙালি মেয়েদের মতো তো নয়।

বটু একটু হাসল। বলল, ভুলে যাচ্ছেন কেন যে, আপনার ছেলেও সাহেব। বিলেতে জন্মেছে, ওখানে পড়াশুনো করেছে, সে কি আর বাঙালি আছে?

সেও ঠিক। জয় তো বাংলা বলতেই পারে না।

তাহলে আর কী!

মেয়ের অবশ্য একটি গুজরাটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।

ভাল।

বাঙালি না হলেও ইন্ডিয়ান, এইটেই যা সান্ত্বনা। কী বলুন?

বোধহয় ঠিকই বলেছেন।

আপনার ছেলের বয়স এখন কত?

সাতাশ প্লাস।

বেশ অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে গেল!

হ্যাঁ। সুস্মিতার ছেলের বউ দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছিল, তাই। নইলে সাজু এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করত না।

খুব মাতৃভক্ত বুঝি?

হ্যাঁ, সাজু মা ছাড়া কিছু বুঝত না।

তা হলে তো সুস্মিতা মারা যাওয়ায় খুব শক্‌ড!

তাও নয়। সুস্মিতা ওকে এমন ভাবেই মানুষ করেছে যাতে শক্ত ধাতের তৈরি হয়। তাই সামলে নিয়েছে।

আর ছোটজন?

সেও মায়ের খুব ভক্ত। তবে প্র্যাকটিক্যাল। বাস্তবকে মেনে নিতে পারে।

আপনারা সবাই বেশ শক্ত ধাতের। আমরা এতকাল ম্যাঞ্চেস্টারে থেকেও ইংরেজদের মতো হতে পারলাম না। ওরাও বেশ শক্ত ধাতের। বাড়িতে শোকের ঘটনা ঘটলেও কেতা ছাড়ে না।

আপনাদের ওরকম হওয়ার দরকার কী?

হতে পারলে ভালই হত। অনেক দুশ্চিন্তা থেকে ছুটি পেতাম। এখন শুনুন, কাজের কথা বলি। কবে আপনার আসার সময় হবে বলুন তো! আজ আমরা ফ্রি আছি। আসবেন?

আজ! আজ তো হবে না। আজ একজনের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

না হয় বেশি রাতেই আসুন। আমাদের এখানে একটা ভাড়া নেওয়া গাড়ি আছে, পৌঁছে দেবো।

একটু দোনোমোনো করে বটু স্বগতোক্তির মতো বলল, আসলে কত রাত হবে সেটাই তো জানি না। লোকটার হয়তো অনেক কথা আছে। কত সময় নেবে কে জানে!

বলেই বটু লজ্জা পেল। এই হল সেই লিকেজ যার ওপর

তার কোনও হাত নেই। হঠাৎ হঠাৎ এক একটা কথা তার অজান্তে বেরিয়ে যায়।

অপরাজিতা বলল, তা হলে কাল আসুন। সন্ধেবেলা গাড়ি পাঠিয়ে দেবো।

তার দরকার নেই, আমি নিজেই যেতে পারব।

সন্ধেবেলা আমাদের বাড়ি খুঁজে বের করতে আপনার অসুবিধে হবে। এখানে নম্বর সব উল্টোপাল্টা। আপনি সংকোচ করবেন না, গাড়ির সারাদিনের ভাড়া তো আমাদের দিতেই হবে। আপনাকে নিয়ে এলে তো আর বাড়তি কিছু করতে হচ্ছে না।

ও আচ্ছা।

তা হলে সন্ধে ছটা?

ঠিক আছে।

আমার কর্তা জিজ্ঞেস করছেন আপনার ফেবারিট ড্রিংক কী!

ওঃ। না, আমি ড্রিংক করি না।

সে কী! মিলিটারিতে ছিলেন, ড্রিংক করেন না?

আমার বোধহয় এলার্জি আছে। ড্রিংক করলে পেটে ব্যথা হয়।

তা হলে তো ড্রিংক বাদ দিতে হয়। কী খেতে ভালবাসেন?

সবই খাই।

সব বলতে?

যা খাওয়াবেন। শুধু মিষ্টিটা নয়।

ব্লাড সুগার?

না। এমনিতেই মিষ্টি খাই না।

সুস্মিতা আমাকে বলেছিল কম্যান্ডো ট্রেনিং-এর সময় আপনি নাকি সাপটাপ খেতেন।

বটু হাসল, হ্যাঁ, ওটা রুটিনের মধ্যেই পড়ে। এনিমি টেরিটোরিতে সারভাইভ্যালের জন্য ওসব অভ্যাস করানো হয়। তা বলে আমার নরমাল ডায়েটে সাপখোপ থাকে না কিন্তু।

অপরাজিতা খুব হাসল। বলল, ভয় নেই, আপনাকে

সাপটাপ খাওয়াবো না। মা গো! সাপের কথা ভাবলেই গা ঘিন ঘিন করে। রাতে ভাত না রুটি?

যা খুশি।

আপনি খুব ইজি গোয়িং ম্যান। আমার কর্তাটির আবার খুব বাছবিচার। পিঙ্কি আছে? ওকে একটু দিন না।

এই তো বেরিয়ে গেল।

মেয়েটার সঙ্গে কথা বলে এত ভাল লাগল।

ওঃ হ্যাঁ, পিঙ্কি বলছিল আপনারাও একদিন আসুন।

খুব চেষ্টা করব। আসলে আমরা পুরী যাচ্ছি বেড়াতে। দিন সাতেক পর ফিরব। তারপর একদিন যাবো।

ঠিক আছে।

পিঙ্কি আর সাজুকে একদিন খাওয়ানোর ইচ্ছে। তবে বাড়িতে নয়। কোনও ভাল হোটেলে।

আপনি বুঝি খুব খাওয়াতে ভালবাসেন?

ভীষণ।

ভাল। খুব ভাল।

২

কখনও কখনও এক একটা দিন আসে ভিতরটা একদম আপসাইড ডাউন হয়ে যায়। এভরিথিং টপসি টারবি। আর তখন তার কারও সঙ্গে খুব ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে। ভীষণ চেঁচামেচি করার ইচ্ছে হয়। আর খুব খিদে পায়। আর দাঁত দিয়ে নখ কাটতে ইচ্ছে হয়।

সে খুব একটা সুন্দরী নয়। আবার খারাপও নয় দেখতে। নাকটাই যা একটু মোটা, ঠোঁট সামান্য পুরু। মিনিবাসে দাঁড়িয়ে থেকে সে একজন মহিলার কাঁধের পাশ দিয়ে আয়নায় নিজের মুখটা মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছে। তার রংটা মাজা, কিন্তু চোখ সুন্দর। কিন্তু আজ সে নিজের সৌন্দর্য দেখছে না। দেখছে তার মুখে রাগ বা অস্থিরতা কতটা ফুটে আছে। দেখে বুঝতে পারছে না। নিজের মুখের ভাব কি নিজে বোঝা যায়! কিন্তু অন্যেরা ঠিক বুঝতে পারে। বন্ধুরা দেখেই বলবে, এই, আজ তোর মুড অফ নাকি রে?

রাসবিহারীর মোড়ে টুক করে নেমে পড়ল পিঙ্কি। আজ বার বার কান গরম হয়ে যাচ্ছে, গরমটাও বেশি লাগছে। তার পরনে জিনস, সাদা কামিজ আর পায়ে স্নিকার। বাঁ হাতের কব্জিতে যে ঘড়িটা বাঁধা রয়েছে সেটা পুরোপুরি গিজমো। অ্যানা-ডিজি-টেম্প এবং মুনফেস আর স্টপওয়াচ। তার বাবা সিঙ্গাপুর থেকে এনেছিল, পিঙ্কি নিয়ে নিয়েছে। বাবার জিনিস সে যা-খুশি নিয়ে নেয়, কোনও আপত্তি ওঠে না কখনও। ঘড়িতে এখন দশটা চুয়ান্ন। আরও দশ মিনিট পর ট্রেন আসবে।

সে ব্যাগটা কাঁধ বদল করে কালীঘাট স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে পাতালে নামতে লাগল। সময় আছে।

নীচে নামলেই মনে হয়, আউট অব ক্যালকাটা। পরিচ্ছন্ন,

ঝকঝকে, শান্ত এই জায়গাটার সঙ্গে কলকাতাকে মেলানোই যায় না। পিলারে লাগানো বাতাসের জাফরির সামনে দাঁড়াল পিঙ্কি। এখন তার ঠাণ্ডা বাতাস দরকার।

প্রেসিডেন্সি কলেজের আরও দুজন যায় এই স্টেশন থেকে। কিন্তু সবসময়ে দেখা হয় না। আলাদা কম্বিনেশন, আলাদা সময়ে ক্লাস। আজ পিঙ্কি দাঁড়ানোর দু মিনিটের মাথায় প্রিয়াঙ্কা এল।

হাই পিঙ্কি!

হাই।

একথা পিঙ্কি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না যে, তার বিয়ের পর থেকে বন্ধুদের সঙ্গে তার সম্পর্ক একটু আলগা হয়েছে। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না। কথা হয়, আড্ডা হাসি-ঠাট্টা সব হচ্ছে, তবু পিঙ্কি বুঝতে পারে ওরা ঠিক আগের মতো খোলামেলা নয় আর তার কাছে। খুব সূক্ষ্মভাবে তাকে একটু অ্যাভয়েডও করে।

তার বন্ধু কুয়াশা শুনেই চমকে উঠে বলেছিল, এ মা! বিয়ে! বিয়ে কী রে? সেটা তো বিচ্ছিরি ব্যাপার! ক্লামজি অ্যাফেয়ার।

নাক সিঁটকোনোটা ছিল প্রায় ইউনিভার্সাল।

আই. পি. এস. পাত্র? সো হোয়াট? তোকে তো আগে দেখতে হবে তুই কী হলি! আগে ক্যারিয়ার কর, তারপর দেখা যাবে। বিয়ে, বিয়ে, অ্যান্ড বিয়ে! হোয়াট ইজ ইন দি ম্যারেজ ইয়ার?

পিঙ্কির ক্ষেত্রে সেটা হয়নি। এটাও সত্যি যে, বিয়েতে পিঙ্কির অমত ছিল না। তাদের রক্ষণশীল যৌথ পরিবারেও এই বিয়েতে সবাই একমত ছিল। পাত্র অতি উজ্জ্বল ছাত্র, পরিবার নিষ্কণ্টক, জ্যোতিষীর রায়ও খুবই অনুকূল। রাজযোটক। পিঙ্কির অমত ছিল না, তার কারণ সে ছেলেবেলা থেকেই আই. এ. এস. বা ওই পর্যায়ের পুরুষকেই স্বামী হিসেবে বেছে রেখেছিল। কিন্তু বন্ধুদের রি-অ্যাকশন তাকে একটু দমিয়ে দেয়। বেশি বিচার করার সময় পায়নি। হবু শাশুড়ি মরো-মরো। একটা মানবিক কারণকে ধরে নিয়ে সে

বিয়ে করে ফেলল।

এই তোর হানিমুন হয়েছে?

কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে পিঙ্কি বলল, সময়ই হল না। মাই মাদার ইন ল ওয়াজ ইন ডেথবেড। ফ্ল্যাটটা তখন নার্সিং হোম। বিয়ের এক মাস পরে ভদ্রমহিলা মারা গেলেন। তারপর তো অনেক ব্যাপার—

আই নো অল দি কামবারসাম হিন্দু রিচুয়ালস। হবিষ্যি, শ্রাদ্ধ, নিয়মভঙ্গ অ্যান্ড লটস অব আদার থিংস। আরে বাবা, ডেথ ইজ ডেথ, কোয়াইট এ ন্যাচারাল থিং। জাস্ট স্টপ এ হোয়াইল, শো রেসপেক্ট অ্যান্ড দেন ক্যারি অন। তা নয়, একগাদা কমপ্লিকেশনস তৈরি করা।

ঠিক তাই।

আচ্ছা, তোরা কি ব্রাহ্মিণস?

ইয়া।

তোর যে বিয়ে হল এরাও কি ব্রাহ্মিণস?

হ্যাঁ, আমাদের বাড়ি খুব কনজারভেটিভ।

মাই গুডনেস! হোয়াট এ জোক। আর আমার কি জানিস? আমি চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত জানতামই না আমরা ব্রাহ্মিণ না কায়স্থ না অন্য কিছু।

যাঃ। তাই হয় নাকি?

বিশ্বাস কর। হোয়েন আই ওয়াজ ফোর্টিন তখন আমাদের পাশের বাড়ির একজন বুড়ো লোক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমাদের বর্ণ কী? আমি বর্ণ মানে জানি কমপ্লেকশন। বললাম। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কমপ্লেকশন কীরকম। উনি খুব হাসলেন। তারপর বললেন, তোমরা ব্রাহ্মণ না কায়স্থ?

বাট হোয়াই ডিড হি আস্‌ক্?

লোকটার খারাপ মতলব ছিল। ওর ছোটো ছেলে দিল্লি না কোথায় যেন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স পড়ছিল। মনে হয়, ছেলের জন্য আমাকে পাত্রী ঠিক করতে চেয়েছিলেন।

তারপর?

বর্ণ জিজ্ঞেস করায় আই ওয়াজ ইন এ স্যুপ। বাড়িতে এসে মাকে জিজ্ঞেস করায় মা বলল, আমার বাবা একজন ব্রাহ্মিণ। আমাদের পদবি চৌধুরী হলেও উই আর অ্যাকচুয়ালি গাঙ্গুলি। কিন্তু মা কামস ফ্রম এ মণ্ডল ফ্যামিলি। দে আর নট ব্রাহ্মিণস। ইট ওয়াজ অ্যান ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ।

এসব তুই জানতিস না?

কী করে জানব। মা আর বাবা তো রিলেটিভদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখে না। বিয়ের জন্যই নাকি দে ওয়্যার আউটকাস্টস্। এই চল একটু এগিয়ে যাই। সামনে পিছনে ভিড় হয়। মাঝামাঝি দাঁড়ালে জায়গা পাওয়া যাবে।

গাড়ি এল। পাশাপাশি বসে পিঙ্কি বলল, তুই তা হলে পুরো ব্রাহ্মণ নোস। হাফ হাফ।

ঠোঁট উল্টে প্রিয়াঙ্কা বলল, আই ডোন্ট কেয়ার। উই আর বিফ ইটিং, পর্ক ইটিং ব্রাহ্মিণস।

প্রিয়াঙ্কাকে খুব একটা পছন্দ নয় পিঙ্কির। একটু নাক-উঁচু। ঝগড়ার একটা সূত্র পেয়ে গিয়ে পিঙ্কি বলল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ব্যাড। এভরিবডি শুড নো হিজ অর হার অ্যানসেস্টরস।

আই ডোন্ট বদার। অ্যানসেস্টরস আর পাস্ট। আই অ্যাম প্রেজেন্ট।

অ্যানসেস্টরস না থাকলে তুইও তো হতি না। ইউ মাস্ট বি রেসপেক্টফুল টু দেম।

নাক-উঁচু হলেও প্রিয়াঙ্কা বোধহয় ঝগড়ুটে নয়। কথাটা পট করে মেনে নিয়ে বলল, মে বি ইউ আর রাইট। বাট সামটাইমস ইট ইজ নট পসিবল টু—

তুই গীতা পড়িসনি? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন চতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্ট— অর সামথিং লাইক দ্যাট।

তার মানে কী?

ইট মিনস কাস্ট সিস্টেম ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই গড।

আমাদের বাড়িতে একটা ইংরিজি গীতা আছে, বাই শ্রীঅরবিন্দ। বাবা মাঝে মাঝে পড়ে। আমি একদিন পড়তে গিয়ে দেখি ইট ইজ ফুল অব ইমপসিবল থিংস। ডু ইট, ডোন্ট

ডু দ্যাট অ্যান্ড সর্টস অব থিংস। আরে বাবা, আমার জীবনটা তো আমার, অ্যান্ড আই ওনলি নো হোয়াট ইজ গুড অর ব্যাড ফর মি। বাট আই অ্যাডমিট শ্রীকৃষ্ণ ওয়াজ এ গ্রেট লাভার। রাধা ওয়াজ এ হাউজওয়াইফ অ্যান্ড ইয়েট দে হ্যাড এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনস।

পিঙ্কি কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চুপ করে রইল। তার মনটা আজ উল্টোপাল্টা। একটু ঝগড়া করলে হত, কিন্তু প্রিয়াঙ্কাটার সঙ্গে হবে না। মেয়েটা কেমন যেন বোকা-বোকা।

কলেজে আজ অনেকদিন পর কিংশুকের সঙ্গে দেখা। অফ পিরিয়ডে পিঙ্কি মাঠে বসে তার টিফিন খাচ্ছিল। সেদ্ধ সব্জি আর দই।

আরে কিংশুক! কোথায় ছিলি এতদিন! আমি তো ভাবলাম তোর ম্যালেরিয়া হল নাকি!

আরে না ভাই। সান্দাকফু গিয়েছিলাম ট্রেকিং করতে। তোর কী খবর? হাউ আর ইউ ইন ওয়েডলক?

খারাপ কী?

তোর তো এখন দুটো বাড়ি। একটা বাপের বাড়ি, একটা শ্বশুরবাড়ি। সময়টা ভাগ করছিস কীভাবে?

সময় ভাগ করব কেন? আমি শ্বশুরবাড়িতেই থাকি।

বাপ রে! ইন লায়নস ডেন?

মোটেই না। আমার বাপের বাড়িতে জয়েন্ট ফ্যামিলি, একগাদা লোক, ঘিঞ্জি, স্পেস নেই। শ্বশুরবাড়ি সাউথে, লোক কম আর নিরিবিলি।

আর পতিদেবতাটি! হোয়াট অ্যাবাউট দি আই.পি.এস.?

ভাল।

শুধু ভাল হলেই তো হবে না। হাউ গুড ইজ হি ইন বেড?

মারব থাপ্পড়। অসভ্য কোথাকার! হি ইজ গুড ইন এভরিথিং।

এঃ হেঃ, এত পতিভক্তি! তুই তো ভোগে চলে গেছিস।

গেছি তো গেছি। আই অ্যাম হ্যাপি।

ইউ ডোন্ট লুক হ্যাপি।

আই অ্যাম।

কী জানিস, আমারও সিভিল সার্ভেন্ট হওয়ার একটা ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আজকাল আমলাদের যা অবস্থা। মন্ত্রী, এম.এল.এ সবাইকেই সেলাম ঠুকতে হয়। তারচেয়ে বাবা খড়্গপুর আই.আই.টি-ই আমার ভাল।

পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও আজ তার সেদ্ধ সব্জি আর দই খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আজ তার ভিতরটা ওলটপালট। তার ঝগড়া করতে ইচ্ছে হচ্ছে, চেঁচাতে ইচ্ছে করছে, ঝাল মশলাদার কিছু হাউমাউ করে খেতে ইচ্ছে করছে।

পিঙ্কি টিফিন বাক্স বন্ধ করে উঠে পড়ল, যাই রে!

কোথায়!

পিঙ্কি প্রশ্নটার জবাব দিল না। আজকাল বন্ধুদের তার অন্যরকম লাগে। অ্যালিয়েনসা বন্ধুদের সঙ্গে তার একটা শ্রেণীগত পার্থক্য ঘটে গেছে। আর তার বিয়েটাই এর কারণ। পূজা সেদিন বলেই ফেলেছিল, মা কী বলে জানিস! বলে বিয়েওলা মেয়েদের সঙ্গে মিশিস না। দে উইল প্ল্যান্ট আইডিয়াজ ইন ইওর হেড। আমি অবশ্য কথাটাকে পাত্তা দিইনি। অল সুপারস্টিশনস।

পিঙ্কি রাস্তায় বেরিয়ে একা হল এবং স্বস্তি বোধ করল। বিয়ে করার পর বন্ধুদের প্রতিক্রিয়া দেখে সে একটু বিমর্ষ হয়েছে বটে, কিন্তু সাজুকে তার খারাপ লাগে না। সাজু বেশ ভদ্রলোক এবং একেবারেই কোনওরকম অসুবিধার সৃষ্টি করে না। একটু কম কথা বলে, একটু আত্মমগ্ন থাকে, কিন্তু পিঙ্কির প্রতি অমনোযোগী নয়।

কিন্তু যে-লোকটাকে তার সবচেয়ে অপছন্দ সে হল সাজুর বাবা। অর্থাৎ তার শ্বশুর। চুয়ান্ন বছর বয়সেও লোকটার চেহারা গরিলার মতো মজবুত। দুখানা ভীষণ তীক্ষ্ণ চোখ। আর অতল গাম্ভীর্য। লোকটা কারও কোনও সাহায্য নেয় না বলে গল্পটল্প করে না, আপনমনে নিজের ঘরে বসে থাকে। সাজুও তার বাবাকে খুব একটা পছন্দ করে বলে মনে হয় না। পিঙ্কি বিয়ের পর লোকটার সঙ্গে ভাবসাব করার চেষ্টা করেছিল। পাত্তা

পায়নি।

সাজু একদিন তাকে বলেছিল, বাবাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

কেন, উনি কি রহস্যময় মানুষ নাকি?

রহস্য-টহস্য কিছু নেই। কিন্তু কখনও মিশুকে নয়। সকলের সঙ্গেই একটা দূরত্ব বজায় রাখে। এমন কী, আমার মার সঙ্গেও।

ইজ হি ক্রুয়েল?

আর্মিম্যান মানেই পেশাদার খুনি। ক্রুয়েল ওদের হতেই হয়। কিন্তু এমনিতে নিষ্ঠুর বলা যায় না। বরং বলা ভাল এ উইথড্রন পারসোনালিটি।

গত কয়েক মাসে পিঙ্কি যেটুকু বুঝেছে, শ্বশুরকে পাত্তা না দিলেও চলে। মাঝে মাঝে গুহা থেকে বেরোয়, আবার গুহায় ঢুকে যায়। একে নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে সে শাড়িটাড়িই পরত। তার বাপের বাড়ির রক্ষণশীল পরিবারেও ওইটেই রেওয়াজ। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে এসে দেখল, এখানে কোনও রক্তচক্ষু নেই, শাসন-তর্জন নেই। সুতরাং পিঙ্কি চট করে মড হয়ে গেল। এখন জিনস, কামিজ, নাইটি যা খুশি পরে। শ্বশুর কিছু খেয়ালই করে না। এ হেন নির্ঝঞ্ঝাট লোককে অপছন্দ করারও কোনও কারণ নেই। পিঙ্কি করে, কারণ তার কেন যেন মনে হয় লোকটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। আর অন্য সবাইকে করুণা করে।

যোগব্যায়ামের ক্লাসে মৈত্রেয়ী আজ তাকে একটু আড়ালে বলল, এই, তুমি কি আজ আপসেট?

কেন বলো তো!

মনে হল যেন মনোযোগ দিচ্ছ না।

রোজ কি ভাল লাগে, বলো!

আমার কিন্তু লাগে। খানিকক্ষণ যোগ করার পর যখন শরীরটা ঝরঝরে লাগে তখন মনটাও ভাল হয়ে যায়, তোমার তো নতুন বিয়ে, না?

হ্যাঁ।

বোধহয় রাতটাত জাগছ। ওতেই একটা ক্লান্তি আসে।

পিঙ্কি একটু বিরক্ত হল। ফের বিয়ের কথা! সে তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, ওসব নয়। আমি ঠিক আছি।

মনাদা যখন আজ সূর্যপ্রণাম শেখাচ্ছিলেন, তখন তুমি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলে।

ঠোঁট উল্টে পিঙ্কি বলল, ও আসনটা আমি জানি, তাই—

এবার গায়ে পড়ে মৈত্রেয়ী বলল, শোনো, তুমি কি ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ব্যবহার করো! সাবধান কিন্তু। আমার এক মাসি ছয়-সাত বছর টানা ব্যবহার করায় এখন স্টেরাইল হয়ে গেছে।

পিঙ্কির রাগ বাড়ছে, খিদে বাড়ছে। সে একটা ঝটকায় তার ব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল। লোকে যে কেন এত উপদেশ দেয় সে বুঝতে পারে না।

পিঙ্কি বাড়িতে ফিরল সাতটার পর। ধরম ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। ধরম একজন হিন্দিবলয়ের লোক। তার দাদা বাসন্তী থানার কনস্টেবল। পুলিশে চাকরি পাওয়ার ক্ষীণ আশায় ধরম এ বাড়িতে খাটে। লোকটিকে ভালই লাগে পিঙ্কির। কথা বলতে ভালবাসে। পিঙ্কিকে সে মাঝে-মাঝে তার গাঁয়ের ভূতের গল্প শোনায়।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে পিঙ্কি আজ একগাদা নুডলস নিজের হাতে তৈরি করল। খিদের জন্যই বোধহয় আজ মেজাজটা খারাপ যাচ্ছে।

কিন্তু খেতে বসে পিঙ্কি দেখল প্রথম কয়েক গ্রাস খাওয়ার পরই তার হালুম হুলুম খিদেটা উধাও। প্লেটের ওপর স্তূপাকার জটিলতার দিকে চেয়ে সে আনমনে ভাবছে।

বজ্রাঘাতের মতোই হঠাৎ সে তার মন খারাপের কারণটা ধরতে পারল। আজ সকালে প্রলয়ঙ্কর গ্যাস লিকের সময় তার স্বামী এক পায়ে মোজা পরা অবস্থায় পালিয়ে গিয়েছিল। "পালাও, পালাও" বলে চিৎকার করতে করতে। ওই পালানোর হাস্যকর দৃশ্যটা আজ সারা দিন তার অবচেতনে কাজ করেছে।

সাজু পালিয়েছিল, কিন্তু তার বাবা পালায়নি। গরিলার মতো লোকটা খুব শান্তভাবে গিয়ে লিক করা সিলিন্ডার সিল

করেছিল। দুজনের এই তফাতটাই সহ্য করতে পারছে না পিঙ্কি। তার ভয় হচ্ছে, এই ঘটনাটা মাথায় রাখলে সাজুর প্রতি তার হয়তো বিশ্বাস কমে যাবে, যদি ইতিমধ্যেই তা কমে না গিয়ে থাকে।

কিন্তু সবাই যা করে তা তার শ্বশুর করল না কেন? তার শ্বশুরও যদি তাদের সঙ্গে পালিয়ে যেত তা হলে আর ঘটনাটার কোনও প্রতিক্রিয়াই থাকত না। প্রতিবেশীরা বলার সুযোগ পেত না যে, বুড়ো বাপকে বিপদে ফেলে এরা পালিয়েছে।

পিঙ্কি খুব আনমনা হয়ে গেল। মন খারাপের কারণটাকে আবিষ্কার করেও আবিষ্কারকের আনন্দ হচ্ছে না তার। সে গত কয়েক মাসে সাজুকে খানিকটা ভালওবেসে ফেলেছে। বেশ পছন্দসই পুরুষ। কিন্তু আজ রাতে বোধহয় সে লোকটার সঙ্গে শারীরিক মিলন চাইবে না।

বাকি খাবারটা গারবেজে ফেলে সে শোওয়ার ঘরে দরজা বন্ধ করে মেডিটেশনে বসল।

৩

দ্রুত পায়ে হেঁটে লেকটা তিন চক্কর দেওয়ার পর, ঘড়িতে যখন সাতটা বাজতে দু মিনিট ঠিক তখন বটু ধীর পায়ে হেঁটে লেক-এর উত্তর ধারে একটা গাছের নীচে অন্ধকার বেঞ্চটার কাছে এসে দাঁড়াল। বেঞ্চের এক কোণে স্থির মৃতবৎ একটি কোলকুঁজো মানুষ বসে আছে। গায়ে কালচে চাদর মুড়ি দিয়ে থাকায় কেউ বসে আছে বলে প্রথমে ঠাহরই হয় না।

কালীবাবু!

লোকটা একটু নড়ল। সামান্য ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, আসুন। আপনার জন্যই বসে আছি। আজ আপনি দেরি করেছেন।

বটু লোকটার পাশে সামান্য দূরত্ব রেখে বসল। বলল, না দেরি হয়নি। এখনও সাতটা বাজতে ত্রিশ সেকেন্ড বাকি।

লোকটা একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি খুব ডিসিপ্লিন্‌ড। হবে না-ই বা কেন! আফটার অল মিলিটারিতে ছিলেন।

বটু ধীর গলায় বলল, মিলিটারিতে কিন্তু সবকিছু শেখায় না। একটা আরোপিত ডিসিপ্লিন থাকে বটে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। মানুষের ভিতরেও একটা ডিসিপ্লিন দরকার। মিলিটারিতে যদি সেটা হত তা হলে মিলিটারির লোকেরা সুযোগ পেলেই রেপ বা চুরি করত না।

সেটা ঠিক। মিলিটারিদের বদনামও আছে।

বটু একটু চুপ করে থেকে বলল, অনেক সেনসিটিভ এলাকায় মিলিটারির লোকেরাই উগ্রপন্থীদের কাছে অ্যামুনিশনস বিক্রি করে। কারণ ওসব এলাকায় কে কটা গুলি ছুড়ল বা অ্যামুনিশন ব্যবহার করল তার কোনও হিসেব দিতে

হয় না।

ওটা তো নেতিবাচক দিক। কিন্তু ইতিবাচক দিকও তো আছে। যেমন ধরুন মিলিটারিদের মৃত্যুভয় থাকে না।

বটু ফের একটু চুপ করে থেকে বলল, কথাটা ঠিক নয়। মৃত্যুভয় সকলেরই আছে। মিলিটারিরাও তো মানুষ।

আজ তা হলে মৃত্যুভয় নিয়েই কথা হোক কর্নেল রায়।

বটু একটু হাসল, কেন, হঠাৎ মৃত্যুভয় নিয়ে কথা কেন?

ইট ইজ এ ভাইটালি ইম্পর্ট্যান্ট থিং।

পৃথিবীর সব ভয়ই আসে অজানা থেকে। মানুষ সেইসব জিনিসকেই ভয় পায় যা সে জানে না। মৃত্যুও তেমনি এক অজানা জিনিস।

তা কেন? এই যে সাপ, সাপকে তো আমরা চিনি এবং জানি তবু কি ভয় পাই না।

সাপ সম্পর্কে আপনার জানাটা তাত্ত্বিক। তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে ভয় তাড়ানো যায় না। কিন্তু যারা সাপ ধরে বেড়ায়, সাপের খেলা দেখায় কিংবা যারা ল্যাবরেটরিতে সাপের বিষ বের করে তারা সাপের নেচার এবং বিহেভিয়র জানে, সাপকে তারা হ্যান্ডেল করতে পারে, তাই তাদের আর সাপের ভয় থাকে না।

হুঁ। কিন্তু আমাদের আজকের বিষয় হল মৃত্যুভয়। মৃত্যুকে কী করে জানা যাবে বলুন তো! আপনি মিলিটারি ম্যান, নিশ্চয়ই মৃত্যুর কাছাকাছি যেতে হয়েছে! তখন কেমন লাগে?

বটু একটু চুপ করে রইল। তারপর স্বগতোক্তির মতো বলল, ওইখানে একটা গোধূলি রয়েছে।

কী বললেন?

বটু একটু সচকিত হয়ে পিঠ সোজা করে বসল।

গোধূলি না কী যেন বললেন কর্নেল রায়!

বটু ধীর গলায় বলল, আমি বহুবার মৃত্যুর কাছাকাছি গেছি। কিন্তু তখন আমার বয়স কম ছিল। আর অ্যাকশনের সময় মৃত্যুভয়ের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে কতগুলো ক্যালকুলেশন। যারা দুর্গম পাহাড়ে চড়ে, যারা সার্কাসে ট্র্যাপিজের খেলা দেখায়, যারা রেসিং কার চালায় সকলেরই

তো বিপদ নিয়েই কাজ। কিন্তু বিপদের চেয়েও বেশি তাদের মাথায় থাকে ওই ক্যালকুলেশন। কিন্তু আপনি মৃত্যুভয় নিয়ে ভাবছেন কেন?

বয়স যত বাড়ে তত কি মৃত্যুভয় বাড়ে?

বটু একটু ভেবে ধীরভাবে বলল, হ্যাঁ। যৌবনে মৃত্যুভয় কম থাকে।

কেন বলুন তো!

বয়স হলে রেজিস্ট্যান্স কমে যায় বলেই বোধহয়।

আপনারও কি কমছে?

বটু একটু ভাবল। বলল, কমারই তো কথা। আপনি কি পান বা সুপুরি কিছু খাচ্ছেন?

না। আমার মুখে একটা ক্যাপসুল রয়েছে।

কীসের ক্যাপসুল?

সায়ানাইড।

বটু নিজের মেরুদণ্ডে একটা শীতলতা অনুভব করল। অর্ধস্ফুট গলায় বলল, গড!

ভয় নেই। এটা সাধারণ ক্যাপসুল নয় যে গলে যাবে। সম্ভবত রবার বা প্ল্যাস্টিক দিয়ে তৈরি। দাঁত দিয়ে খুব জোরে না চিবোলে মালটা বেরোবে না।

ওটা মুখে রেখেছেন কেন?

চিবোনোর জন্যই। কিন্তু পারছি না। মৃত্যুভয় কাজ করছে। সায়ানাইডে মরতে কতক্ষণ সময় লাগে আপনি জানেন?

বটুর মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করল। শীতলতা কেটে গিয়ে একটা উত্তাপ উঠে আসছে মাথায়। তার ব্লাড প্রেসার নেই। কিন্তু এখন মনে হল, হঠাৎ রক্তচাপটা বেড়ে গেছে। সে মৃদু স্বরে বলল, দুই তিন মিনিটের বেশি নয় বোধহয়। ওটা বের করে ফেলুন।

আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। পারলে অনেক আগেই পারতুম। কিন্তু মাঝে মাঝে ইচ্ছেটা প্রবল হলে ওটা মুখে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। একটু জোর পাই, আবার ভয়ও হয়। খুব ভয় হয়।

ওটা কোথায় পেলেন?

সেই লোকটা দিয়েছিল। সে আমার সর্বনাশ করেছিল বটে কিন্তু এই একটা উপকার করেছিল। আমি তাকে বলেছিলুম, তুমি তো আমার সবকিছুই ঠকিয়ে নিলে, এখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে প্রাণধারণ করার অপমান থেকে উদ্ধারের একটা পথ করে দিয়ে যাও। একটা সায়ানাইড ক্যাপসুল জোগাড় করে দাও আমাকে। আমি দাম দেব।

লোকটা দিল?

করুণাপরবশ হয়ে এনে দিয়েছিল। দুশো টাকা দাম নিয়েছিল।

বটু রুমালে কপালের ঘাম মুছে বলল, আপনি যদি ওটা মুখ থেকে বের করে না ফেলেন তা হলে আমি কিন্তু চলে যাব।

লোকটা শব্দ করে একটু হাসল। তারপর বলল, আপনি খুব বুদ্ধিমান জানি। কিন্তু আমিও একটু বুদ্ধি রাখি।

ও কথা কেন বলছেন?

আপনাকে আমি পছন্দ করি, কিন্তু বিশ্বাস করি না। ক্যাপসুলটা মুখ থেকে বের করলেই আপনি হয়তো আমার হাত চেপে ধরবেন। আপনি মিলিটারি, গায়ের জোরে আমি তো পেরে উঠব না। আপনি যদি ক্যাপসুলটা কেড়ে নেন তাহলে আমি সত্যিকারের নিঃস্ব হয়ে যাব। ওটা আমার মুখেই থাক। কথা দিচ্ছি, এখনই ওটা চিবিয়ে ফেলব না।

বটু একটা শ্বাস ফেলে বলল, ওটা মুখে রাখা বিপজ্জনক।

লোকটা ফের হাসল। তারপর বলল, একটু আগে আপনি মাউন্টেনিয়ার, ট্রাপিজ খেলোয়াড়, রেসিং কার ড্রাইভারদের কথা বলছিলেন না, নিজেকে আমার এখন তেমনই লাগছে। তবে আমার ক্যালকুলেশনটা নেই। না, না, ভুল বললাম। ক্যালকুলেশনও একটা আছে। আজ রাত আটটার পর অমৃতযোগ লাগবে। পঞ্জিকা দেখে এসেছি।

যতদূর জানি, শাস্ত্রে বলে, আত্মহনন করলে মৃত্যুর পর আত্মা অন্ধকার গ্রহসমূহে ঘুরে বেড়ায়।

হ্যাঁ, হয়তো তাই। কিন্তু একটু আগেই আপনি বলেছিলেন, মানুষ মৃত্যুকে জানে না বলেই ভয় পায়। শাস্ত্র যারা লিখে গেছে

তারা কি মৃত্যুকে জানত?

কেউ কেউ জানে, নিশ্চয়ই জানে।

ওটা আপনার অন্ধ বিশ্বাসের কথা। মৃত্যুর পরের কথা বলছেন, কিন্তু মৃত্যুর আগেই তো এই পৃথিবীটা আমার কাছে অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি এক অন্ধকার গ্রহেই ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ল্যান্স নায়েক উধম সিংয়ের বাঁ পা উড়ে গিয়েছিল। সেই ছিন্ন পা বাঁ হাতে ধরে কাঁদছিল উধম। চিৎকার করছিল, ইয়ে ক্যা হুয়া সাব! ইয়ে ক্যা হুয়া ...? তখন গোলাগুলি চলছে। বটু হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল উধমের দিকে। দেখল উধম হঠাৎ তার অটোমেটিক রাইফেলের মুখ নিজের গলায় স্থাপন করেছে। কাঁদতে কাঁদতে বলছে, অ্যায়সা নেহি জিয়েঙ্গে ম্যয়, অ্যায়সা নেহি জিয়েঙ্গে ...। বটুর বুদ্ধি বিনষ্ট হয়ে গেল সেই সময়ে, যে হঠাৎ বোকার মতো নিজের রিভলভারটা বের করে দাঁড়িয়ে উধমের দিকে তাক করে বলল, ইফ ইউ ডু ইট আই শ্যাল কিল ইউ! কী হাস্যকর পরিস্থিতি। যে-লোকটা মরার জন্যই নিজের বন্দুক দিয়ে নিজেকে তাক করে আছে তাকে "কিল ইউ" বলে ভয় দেখানোর মতো বোকামি আর কী হতে পারে। আজও ভাবলে বটু একা একা হেসে ওঠে। আর অবাকও হয় মানুষের আশ্চর্য বোকামির কথা ভেবে। আশ্চর্য এই কারণে যে, উধম সিং সত্যিই ভয় পেয়ে রাইফেল ফেলে দিয়েছিল। আজও হরিয়ানার কোনও গাঁ বা শহরে উধম হয়তো ক্রাচ-এ ভর করে হেঁটে বেড়ায়।

এবার লোকটাকে কী বলবে বটু তা ভেবে পেল না। চুপ করে নিজের মাথার ঝিম ঝিম ভাবটাকে শান্ত করার জন্য মনটাকে শক্ত করার চেষ্টা করল।

লোকটা লেকের ওই পাশে চেয়ে থেকে বলল, একটা লোক হুট করে মরে গেলে তার সংসার ভেসে যায়, বউ বিধবা হয়, ছেলে মেয়ে পিতৃহীন হয়, সংসারে আয় কমে যায়। কিন্তু আমার তা নয়। বিয়ে টিয়ে করিনি। ব্যাচেলার মানুষ। এল আই সি-তে কেরানির চাকরি করতাম। বেশ চলে যেত। মেসে বোর্ডিং-এ থেকেই জীবনটা পার করছিলাম। মাঝে মাঝে

বেড়াতে যেতাম। অমরনাথ, কুলু মানালি, বৈষ্ণোদেবী, সাউথ ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান। চাকরির শেষ দিকে সিধু এল। ট্যারা, জিংড়ে চেহারা, মাথায় ছোটো ছোটো চুল, চোখের চাউনিতে কিছু একটা ছিল। ব্যাচেলারদের খুব ভাল বন্ধু টন্ধু হয় না, জানেন? ফ্যামিলিম্যানরা হয় তাকে অ্যাভয়েড করে, নয় তো এক্সপ্লয়েট করে।

জানি।

আমারও বন্ধুবান্ধব বিশেষ ছিল না। কারও বাড়িতে গেলে তেমন খুশি হত না কেউ। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেলেও তাই। তবে আত্মীয়রা আদায় উসুলের চেষ্টা করত। ধার করত, শোধ দিত না। যা হয় আর কী। অফিসের পর আর সময়টা বড্ড একঘেয়ে লাগত। সেইসময়ে সিধু এল যেন পরম বন্ধুর মতো। সে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বউটাও বেশ ভাল। দেখতে লাবণ্যময়ী, হাসিখুশি, খুব খ্যাতির যত্ন করল। মনোহরপুকুরে বস্তিঘেঁষা ছোট্ট বাসা তাদের। ছেলেপুলে নেই। সিধু বলল, আপনি মেসে কেন থাকছেন দাদা? পাশের ঘরটা ফাঁকাই পড়ে আছে, চলে আসুন না এখানে। বড় ভাইয়ের মতো থাকবেন। বউটাও সায় দিল।

বউটির প্রতি আপনার কোনও উইকনেস ফিল করতেন?

লোকটা একটু চুপ করে থেকে হাসল। বলল, আপনি বুদ্ধিমান। ফিল করতাম। খুব ফিল করতাম। ব্যাচেলারদের ওইটে একটা ড্র ব্যাক। মেয়েছেলে সম্পর্কে একটু বোকা হয়। সিধু মনুষ্যচরিত্র ভালই জানত। নতুন ব্যাটসম্যান মাঠে নামলে যেমন ফিল্ডাররা তাকে ঘিরে ফেলে তেমনি সিধু আর তার বউ শ্যামলী দুজনে আমাকে ঘিরে ফেলল। আমার বোকামি, লোভ, অদূরদর্শিতা এসব তারা চোখের পলকে ঠাহর করে নিয়েছিল। শুনলাম সিধু বিদেশি জিনিস বেচে মোটা টাকা আয় করে। সে স্পষ্টই বলত, আমার ব্যবসাটা ভাল নয়, কিন্তু টাকা আছে। বালিগঞ্জে তার নাকি তিনতলা একটা বাড়িও আছে, কিন্তু সেখানে সে থাকে না, পাছে পুলিশ সন্দেহ করে। বাড়িটা বাইরে থেকে দেখিয়েওছিল আমাকে। বলেছিল, রিটায়ার করে

আসুন, আপনাকে আমি এ বাড়িতে একখানা ঘর দেব বিনা ভাড়ায়। তারপর একদিন সে আমাকে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করে দেদার খাওয়াল। তারপর বলল, কী যে কেরানিগিরি করে জীবন কাটাচ্ছেন দাদা, আপনাদের দেখলে মায়া হয়। চারদিকে টাকার খেলা, আর আপনারা মাস মাইনের কটা টাকা নিয়ে পড়ে আছেন। লাগান না আমার ব্যবসায়, দুদিনে লাল হয়ে যাবেন। আচ্ছা বেশি নয় হাজার দুই লাগিয়ে দেখুন। জিনিস আমি সাপ্লাই করব, কাস্টমারও সব আমিই ঠিক করে দেব, ভয় কী?

হ্যাঁ, প্যাটার্নটা আমার চেনা।

আমারও কি চেনা নয়? আবছাভাবে আমিও কি বুঝতে পারিনি যে তারা আমাকে ঘিরে ফেলছে! বুদ্ধিমান তো একেই বলে। আমি দু হাজার টাকা লাগালাম। সে আমাকে চারটে ঘড়ি দিল। চিৎপুরে দুটো দোকানে নিয়ে গেল নিজেই উদ্যোগ করে। পার্টিরা দেখলাম তৈরি। ঘড়ি দিতেই টাকা বের করে দিল। দু হাজারে আমার লাভ হল এক হাজার। চার খেপে মোট দু হাজার টাকা ক্যাপিটালে আমার হাতে প্রায় চার হাজার টাকা এসে গেল দু মাসে। অনেক টাকা। সিকো ঘড়ি, ক্যানন ক্যামেরা, নিকনের দূরবীন—এইসব। কথায় কথায় ব্যবসার গল্প অফিসেও করে ফেলেছিলাম। এক কলিগ বলল, তাই নাকি! এনো তো একটা সিকো ঘড়ি। আমার একটা কেনার ইচ্ছে আছে। পরদিনই ঘড়ি নিয়ে গেলাম। সেই কলিগ ঘড়িটা ভাল করে দেখে টেখে বলল, শোনো কালী, আমাদের তিন পুরুষের ঘড়ির ব্যবসা। আমার বুড়ো বাবা রাধাবাজারে এখনও ব্যবসা করেন। ঘড়ি আমি চিনি। এটা সিকো ঘড়ি নয়, দু নম্বরি মাল। আমি সেই কলিগের ওপর এমন চটে গেলাম যে বলার নয়। চেঁচামেচি, গালাগাল কিছু করতে বাকি রাখিনি। আমি যত জনকে ঘড়ি বেচেছি সবাই বিনা প্রশ্নে টাকা ফেলেছে। সুতরাং...

বুঝেছি। প্যার্টানটা পুরনো।

হ্যাঁ। পুরনো।

বলে যান।

সেটা আমার রিটায়ারমেন্টের মাস। কয়েকজন একদিন আমাকে ধরে বলল, কালী, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটা সম্পর্কে সাবধান থেকো। মনে হচ্ছে তুমি একটা চক্করে পড়ে গেছ। শুনে আমি উচ্চাঙ্গের হাসি হাসলাম। সিধুকে কথাটা বলায় সে বলল, দু মাসের মধ্যে যদি আপনি ওদের নাকের ডগা দিয়ে গাড়ি করে না ঘুরে বেড়ান তা হলে আমার নামে কুকুর পুষবেন। শ্যামলী খুব মিষ্টি করে বলল, ভয় পাবেন না দাদা, আমি তো জানি এ ব্যবসাতে কোনও গোলমাল নেই। রিটায়ার করলাম, হাতে মোটা টাকা এসে গেল। সিধু বলল, দাদা, বাজার খুব তেজী, মাল সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারছি না। কিছু লাগাবেন নাকি? একটু দোনোমোনো যে করিনি তা নয়। একটা মুভি ক্যামেরা দশ হাজার টাকায় কিনে ষোলো হাজারে বিক্রি করলাম। কিন্তু এবার পার্টি ক্যাশ টাকা দিল না। বলল সামনের মাসের দু তারিখে আসুন, পেমেন্ট নিয়ে যাবেন। পোর্টেবল টিভি, ভি সি আর এবং পর পর আরও কয়েকটা জিনিস ঠিক এইভাবে বিভিন্ন পার্টি নিয়ে নিল এবং পেমেন্টের তারিখ দিয়ে দিল। আজ অবধি—

বুঝেছি।

হঠাৎ একদিন মধ্যরাতে মেসের ঘরে ঘুম ভেঙে উঠে আমিও ঠিক ওই কথাটাই বলে উঠেছিলাম, বুঝেছি। কিন্তু এখন আর বুঝে লাভ নেই। আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি তখন।

শ্যামলী?

হ্যাঁ, শ্যামলী খুব করুণ মুখ করে বলত, ব্যবসায় ওঠা-পড়া আছেই। কী করবেন!

সিধু?

খুব দুঃখ করত, এ পার্টিটা একদম দু নম্বরি। পেমেন্ট নিয়ে ঘোরাচ্ছে।

ওরা আর খাওয়াত না?

খাওয়াত। চা বিস্কুট। পরের দিকে বিস্কুটও নয়।

বটু চুপ করে রইল। লোকটা মুখের ক্যাপসুলটা একটু চুষে নিল বোধহয়। তারপর বলল, আই অ্যাম এ বেগার নাউ। কিন্তু

আমি আজও কারও কাছে হাত পাতিনি। একটা লাইফ পলিসি ম্যাচিওর করায় সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম, তাই দিয়ে এই মাসটা পর্যন্ত চলল। পরের মাস আর চলবে না। বুঝেছেন কর্নেল সাহেব? এই গ্রহটা আমার কাছে ক্রমে ঘোর অন্ধকার হয়ে আসছে।

লোকটা কোথায়?

সিধুর কথা বলছেন?

হ্যাঁ।

সে তার জায়গাতেই আছে। অনেকেই তাকে দোষ দেয়। আমি দিই না। ভেবে দেখলে সিধু তো কোনও লোক নয়। আমার কাম, লোভ, অদূরদর্শিতাই তো সিধু হয়ে এসে দাঁড়াল। তাই না? সিধু তো একটা রুটিন ওয়ার্ক করে গেছে মাত্র। জোচ্চোররা তো আহাম্মকদের ওপরেই নির্ভরশীল।

আপনি এবার ক্যাপসুলটা বের করে ফেলুন।

ভয় পাচ্ছেন কেন? আমার পরিস্থিতি এখন টার্মিনাল পয়েন্টে পৌঁছে গেছে। আজ, কাল বা পরশু আমাকে থেমে যেতেই হবে। তবে আজ অমৃতযোগটা আছে। আটটা বেজে দশ মিনিটে লাগবে। কটা বাজে কর্নেল রায়?

পৌনে আটটা।

আমার হাতেও একটা ঘড়ি আছে। সেই সিকো ঘড়ি। দিনে আধ ঘণ্টা করে স্লো হয়ে যায়। আমার ঘড়িতেও এখন পৌনে আটটা বাজে। কর্নেল সাহেব, আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না। অমৃতযোগ শুরু হয়ে গেছে।

আপনার বয়স কত হল?

ষাট। কেন বলুন তো।

শাস্ত্রে বলে বার্ধক্য শুরু হয় পঁয়ষট্টিতে।

তাই নাকি?

পঁয়ষট্টির পরে বিয়ে করা শাস্ত্রে নিষেধ।

এসব কথা বলছেন কেন?

আপনার বার্ধক্য তো এখনও শুরু হয়নি।

বার্ধক্য শুরু না হলেও মৃত্যু শুরু হয়ে গেছে। কর্নেল সাহেব,

একটু সাহস দিন তো। এ সময়টায় মৃত্যুভয় আসছে কেন? শুনেছি সায়ানাইড চমৎকার বিষ, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ... নো পেইন, নো সাফারিং, নো হুইস্পার। ক মিনিট লাগে বললেন? দু তিন মিনিট?

ওই দু তিন মিনিট বড্ড লম্বা। কাটতেই চায় না।

তা হোক তা হোক। দু তিন মিনিট সাফার করা কি আমার উচিত নয়?

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল বটু, ক্ষীণ গলায় হাত বাড়িয়ে বলল, গুডবাই দেন।

লোকটা চাদরের তলা থেকে ডান হাতটা যখন বের করছে তখন বটু তার ক্যালকুলেশন করে যাচ্ছে। সূক্ষ্ম বিপজ্জনক ও ভয়ংকর ক্যালকুলেশন। একটু ভুলচুক হলেই—

লোকটার হাত এগিয়ে এল। বটু সেটা ধরল না। তার ডান হাতটা বিদ্যুৎগতিতে লোকটার মাথার একপাশে গিয়ে লাগল। মুখটা ঘুরে গেল ডাইনে। ঝুলে গেল।

বটু নিচু হয়ে সংজ্ঞাহীন লোকটার চোঁয়াল ফাঁক করে মুখের ভিতরে আঙুল ঢুকিয়ে ক্যাপসুলটা বের করে নিয়ে পকেটে ভরে ফেলল। তারপর কয়েক পা নেমে লেক-এর জলে রুমাল ভিজিয়ে এনে ঝাপটা দিল লোকটার চোখে মুখে।

একটু পরে লোকটা ধীরে ধীরে মাথাটা সোজা করতে পারল।

বটু আর দাঁড়াল না। লোকটা বাড়ি যাক, ভাবুক, সিদ্ধান্ত নিক। হয়তো অন্য কোনও উপায়ে লোকটা মরবেই। কিংবা বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কী হবে কে জানে। বর্তমানটুকু শুধু মানুষের হাতে আছে। বর্তমানটাই তো আসল।

বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বটু বাথরুমে ঢুকল। ক্যাপসুলটা পকেট থেকে বের করে সে ভাল করে দেখল। লোকটা ভুল বলেনি। খোলটা সাধারণ ক্যাপসুলের নয়। পলিইউরিথিন বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি। সাবান জলে ক্যাপসুলটা খুব ভাল করে ধুয়ে ফেলল

বটু। তারপর ঘরে এসে সে ক্যাপসুলটা ক্যাবিনেটের ভিতর সুস্মিতার ছুঁচসুতোর কৌটোর মধ্যে রেখে দিল। এ বাড়িতে ছুঁচ সুতোর খোঁজ হওয়ার সম্ভাবনা কম। এ ঘরে কেউ তেমন আসেই না।

ডিম লাইট জ্বেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বটু। ওইখানে কোথাও একটা গোধূলি রয়েছে।

একটা লম্বা সাপ তার দীর্ঘ ফণা উঁচুতে তুলে দুলছে। তার প্রলম্বিত ছায়াটি পড়েছে মানুষের আয়ুষ্কাল জুড়ে। কখন সে ছোবল দেবে তার কোনও ঠিক নেই। কখনও কখনও চোখ তুলে সাপটাকে দেখে দীর্ঘ ছায়ায় বাস করতে করতে মানুষ আবার তার ছায়ার নীচেই পাতে ঘরসংসার, কাঁদে খায় ঘুমোয়। মাঝে মাঝে হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখে নেয় ছোবল নামল কি না, তার আয়ুষ্কাল জুড়ে ছায়াটি দোলে আর দোলে।

দরজায় নক করে পিঙ্কি বলল, খেতে আসুন।

গভীর সম্মোহন থেকে উঠে এল বটু। হ্যাঁ, তার খিদে পেয়েছে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

খাওয়ার টেবিলে বসতে গিয়ে সমকোণে বসে থাকা সাজুকে এক ঝলক দেখে নেয় বটু। সাজুর মুখটা একটু লালচে, ভ্রূ সামান্য কোঁচকানো বলে মনে হল। ঠিক মুডে নেই। লম্বা টেবিলের ওপাশে আজ পিঙ্কি বসে আছে। বটুর দিকেই চোখ। মেয়েটা তাকে অপছন্দ করে। কেন করে কে জানে!

সাজু হঠাৎ বটুর দিকে চেয়ে বলল, অকারণে অতটা রিস্ক নেওয়ার কিন্তু কোনও দরকার ছিল না বাবা।

বটু একটু অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকাল। বলল, কীসের রিস্ক?

গ্যাস লিকের ঘটনাটার কথা বলছি।

ও। বলে বটু চুপ করে শূন্য প্লেটের দিকে চেয়ে রইল। চাপাটি সেঁকার গন্ধ আসছে। মাংসের গন্ধ আসছে। তার খিদে পেয়েছে।

সাজু বোধহয় কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কী বলতে চায় তা বটু আবছা আন্দাজ করতে পারে। গ্যাস

লিকের সময়ে ও যে পালিয়ে গিয়েছিল তার অপরাধবোধ কাজ করছে। ও বলতে চাইছে, বটুও যদি পালাত তা হলে ওর কোনও অস্বস্তি হত না, হয়তো নতুন আর অল্পবয়সী বউয়ের চোখে নিজেকে ছোট বলে মনে হচ্ছে ওর। এবং নিজের ভূমিকাকে ঠিক জাস্টিফাই করতে পারছে না।

পিঙ্কি ওপাশ থেকে বলল, আপনাকে কি ঠেকুয়া দেব?

অন্যমনস্ক বটু বলল, উঁ!

ঠেকুয়া। জয়সোয়ালরা সকালে দিয়ে গিয়েছিল। ফ্রিজে রেখেছি।

ভ্রূ কুঁচকে একটু ভেবে বটু বলল, দিতে পার। অনেকদিন ঠেকুয়া খাইনি।

মিসেস জয়সোয়াল বলে গেছেন, খাঁটি ঘি দিয়ে ভাজা।

বটু বলল, ও।

সাজু রোজ পাঁচখানা করে রুটি খায়। আজ দুটোর বেশি খেল না। মাংসটাও পড়ে রইল খানিকটা বাটিতে। আজ ওর মুড ভাল নেই বোধহয়। জিনিসটা এমনিতেই শক্ত। তার ওপর ফ্রিজে থাকায় আরও শক্ত হয়ে গেছে। চিবোতে সময় লাগছিল। কিন্তু অতীব সুস্বাদু, মৃদু মিষ্টি জিনিসটা সে ফেলেও উঠতে পারছিল না।

পিঙ্কি টেবিলের ওপাশে বাটিতে সুপটুপ কিছু একটা নিয়ে বসে আছে। হঠাৎ বলল, আপনি কখনও সাপ ধরেছেন?

বটু চোখ তুলে বলল, কী?

আপনি কখনও সাপ ধরেছেন? বিষাক্ত সাপ!

হঠাৎ একথা কেন?

এমনি জানতে চাইছি।

বটু মুখটা নামিয়ে বলল, একসময়ে আমাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল।

আপনি কখনও কিং কোবরা ধরেছিলেন?

বটু একটু চুপ করে থেকে সামান্য হেসে বলল, মনে পড়ছে না। কিন্তু আজ হঠাৎ সাপের কথাই বা উঠছে কেন?

আজকের সকালের ঘটনায় আপনার ছেলে খুব টেনশন

করছে। একটু আগে ফিরে এসেই আপনার প্রসঙ্গ তুলে বলল, বাবার যা সব কাণ্ড! হবে না কেন, যে লোক হাত দিয়ে কিং কোবরা ধরতে পারে তার পক্ষে সবই সম্ভব।

ও।

আমাকে ঘটনাটা বলেনি। আপনার কাছে তাই জানতে চাইছি, এ রকম কিছু কি হয়েছিল?

বটু একটা হতাশার শ্বাস ছাড়ল। এদের আজ হয়েছে কী? একটা সামান্য ঘটনা থেকে এত ফ্যাঁকড়া বেরোচ্ছে কেন? ঘটনা এ রকম একটা ঘটেছিল অরুণাচল প্রদেশে মিলিটারি কোয়ার্টার্সে। দুপুরবেলা কোয়ার্টার্সের পিছনেই ঘন জঙ্গলে পায়খানা করতে গিয়েছিল তাদের বুড়ি ঝি সুখিয়া, সেই দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দিয়েছিল, বিরাট এক সাপ কোয়ার্টার্সের কম্পাউন্ডে ঢুকেছে। তখন বটু দফতর থেকে লান্চ করতে বাড়িতে এসেছিল। সাজু আর তার এক বন্ধু খেলা করছিল পিছনের লনে। বটু লান্চ ফেলে খালি হাতেই ছুটে গিয়েছিল। সাপটা তখন কংক্রিটের একটা স্ট্রিপ পেরিয়ে ঘাস জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছে। কয়েক গজের মধ্যেই ব্যাডমিন্টন খেলছে সাজু। বটু লেজ ধরে সাপটাকে টেনে আনল প্রকাশ্যে। বিশাল সাপ, গায়ে জোরও প্রচণ্ড, চোখের পলকে সাপটা চাবুকের মতো শরীর তুলে পিছনে ছোবল মারল। বটু লেজটায় হ্যাঁচকা মেরে সাপের মেরুদণ্ড কিছু নড়বড়ে করে দেওয়ায় ছোবলটা পড়ল অনেক দূরে। সাপটাকে ধরা যেত। কিন্তু অত বড় সাপকে ধরে কিছু করার ছিল না। উপরন্তু সাপটা দ্রুতগতির এবং তার মারাত্মক বিষ। বটু তাই ঝুঁকি না নিয়ে হ্যামার থ্রো-র হ্যামারের মতো কয়েক পাক ঘুরিয়ে প্যানট্রির দেয়ালে দুবার আছড়ে মেরেছিল। ভয়ঙ্কর হলেও সাপ পলকা প্রাণী। দুটো বিভীষণ আছাড়েই সেটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজটা তেমন বীরত্বের কিছু ছিল না। প্রাণীটাকে জানা থাকলে ভয়ের কিছুই নেই। কিন্তু ছেলের নিরাপত্তার জন্য সাপটাকে মারতে হয়েছিল বলে একটু দুঃখই হয়েছিল তার। শ্বাপদবিহীন কলকাতায় বসে আজ ঘটনাটা যত রোমহর্ষক মনে হবে ততটা কিছুই নয়। সে

শুনেছে পিঙ্কি আরশোলাকেও ভয় পায়।

বটু ঘটনাটা বলল না। বরং বলল, তেমন কিছু নয়।

বলুন না, শুনি।

বটু একটু বিরক্তি বোধ করছিল। খুব শান্ত গলায় বলল, পৃথিবীর কোনও প্রাণীই মানুষের চেয়ে বেশি হিংস্র নয়।

সামান্য তীক্ষ্ণ গলায় পিঙ্কি বলল, আপনি হাত দিয়ে ধরেছিলেন?

হ্যাঁ।

ভয় করল না?

ভয় পেয়েই তো ধরেছিলাম। ভয়, পাছে সাজুকে কামড়ায়।

পিঙ্কি গোল গোল চোখে চেয়ে বলল, তারপর?

ইচ্ছে না থাকলেও মেরে ফেলতে হয়েছিল।

পিঙ্কি এক অদ্ভুত ভোম্বল চোখে তার দিকে চেয়ে ছিল।

বটু ঠেকুয়ার শেষ টুকরোটা খেয়ে উঠে পড়ল। ডাইনিং হল-এর বেসিনে মুখ ধোয়ার সময় বটুর মনে হল, পিঙ্কি খুব চাপা গলায় কিছু বলছে। ঠিক দুবার বাক্যটা উচ্চারণ করল। ভাল বোঝা গেল না। মনে হল, আই হেট ইউ! আই হেট ইউ!

বটু ঘরে এসে দরজাটা দিয়ে দিল। কান দুটো একটু গরম হচ্ছে। অপমানবোধ তার বরাবরই কম। কিন্তু ক্ষীণভাবে সে অপমানটাও টের পাচ্ছে। কিন্তু এসবই তাকে মেনে নিতে হবে।

সামান্য ঠাণ্ডা পড়েছে এখন। দূরাগত মেঘগর্জন শোনা যাচ্ছে। শীতের মুখে বৃষ্টি হয়। বটু আলমারি থেকে একটা চাদর বের করে বিছানায় রাখল। শেষ রাতে হয়তো গায়ে দিতে হবে।

তাদের এই শোওয়ার ঘরটা সুস্মিতা তার মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছিল। এই ঘরে মেয়েলি স্পর্শ আছে। ওয়ার্ডরোবে সুস্মিতার শাড়ি ঠাসভর্তি হয়ে আছে। তিন পিস প্রমাণ সাইজের আয়না, হরেক সাজবার জিনিসে ভরা নিচু টেবিল। অনেক পারফিউম। মিলিটারি স্টোরে অনেক কম দামে কেনা জিনিস। সবই পড়ে আছে।

সুস্মিতা এই ঘরেই মারা যায়। অসুখের শেষ দিকে সে

হাসপাতালে থাকতে চায়নি। বাড়ি বাড়ি করে পাগল হয়েছিল। এবং সুস্মিতাকে কখনও মৃত্যুভয়ে কাতর হতে দেখেনি বটু। একদম শেষ দিন অবধি নয়। আগের দিন কোমায় চলে গেল। সাহসের সঙ্গেই বিদায় নিয়েছিল সুস্মিতা। ওই সাহস দেখে বটু খুশি হয়েছিল। সুস্মিতাকে সারা জীবন তেমন লক্ষই করা হয়নি। ওপর ওপর চেনা তো ঠিক চেনা নয়। চিনতে হয় সংকটের সময়ে। তখন কে কী রকম আচরণ করে সেটাই তার আসল পরিচয়। আর ওই শেষ সময়েই বোধহয় বটু তার স্ত্রীকে প্রথম শ্রদ্ধা করতে শুরু করে।

বটুর মৃত্যুভয় নেই। ছিল না কখনও। কিছু বয়স হলে কী হবে তা কে জানে। চেয়ারে বসে আনমনে মৃদু আলোয় সে সাপের দীর্ঘ ছায়াটা দেখতে পাচ্ছে। সারাটা জীবন জুড়ে কী লম্বা ছায়া। দুলছে আর দুলছে।

শোওয়ার আগে বাথরুমে ঘুরে এসে সে ড্রয়ার খুলে সুস্মিতার কৌটোটা বের করে খুলল। ক্যাপসুলটার দিকে চেয়ে রইল। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে আয়েষা তার বিষের কৌটো পরিখায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল, কারণ বিষের বড় প্রলোভন। বিষ সবসময়েই মানুষকে মৃত্যুর প্ররোচনা দেয়। আশ্চর্য এই, ক্যাপসুলটা বটুকেও সম্মোহিত করে রাখল কিছুক্ষণ। ক্যাপসুল যেন বলল, আর ভয় কী! এই তো আমি, বিপন্ন, একা, বিভ্রান্ত, ত্যক্ত, বর্জিত যাই হও না কেন আমি চোখের পলকে জুড়িয়ে দেব। আর ভয় কী?

বটু কৌটোটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। বাইরে হাওয়া দিয়ে বৃষ্টি নামল জোর, কী সুন্দর ঘুমের রাত আজ। কিন্তু ঘুম আসছিল না। পিঙ্কি কি তাকে ঘেন্না করে? কিন্তু কেন? ওরা দুজনেই করে কি? কিংবা ওরা পরস্পরকে? তিনজনের সম্পর্কটা একটু কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। এত গা বাঁচিয়ে চলেও শেষ অবধি সে কারও অশান্তির কারণ হয়ে উঠছে নাকি?

বৃষ্টির জোর বাড়ছে। হাওয়ায় শব্দ। তবু হঠাৎ বটু দমকা হাওয়ার শব্দ ছাপিয়ে একটা ঝগড়া বা তর্কের শব্দ পাচ্ছে। পিঙ্কি আর সাজু।

এর আগে আর কখনও সাজু আর পিঙ্কির ঝগড়া হয়েছে বলে মনে পড়ে না বটুর। একটু উৎকর্ণ হয়ে রইল। একটু উদ্বেগ বোধ করল। তারপর গরম বালিশে মাথাটা একটু এপাশ ওপাশ করে অস্বস্তিটা তাড়ানোর চেষ্টা করল সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে সে কালীনাথ হালদারের কথা ভাবল। লোকটাকে আজকে একটা ছোট্ট মার দিতে হয়েছে। হয়তো অভিসম্পাত দিচ্ছে তাকে। সায়ানাইড ক্যাপসুল কেড়ে নিলেই যে কালীনাথের মৃত্যুর পথ বন্ধ করা যাবে তা নয়। মরতে চাইলে মরবেই। কিন্তু সুবিধে এই। লোকটার মৃত্যুভয় আছে। সেটাই হয়তো বাঁচিয়ে রাখবে লোকটাকে।

বৃষ্টি ক্রমে নিবিড় থেকে নিবিড়তর হচ্ছে। বাড়ছে দমকা হাওয়ার জোর। পায়ের দিককার জানালা দিয়ে বৃষ্টির রেণু উড়ে আসছে বিছানায়। উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিল বটু। কিন্তু জানালা বন্ধ করার কয়েক মিনিট পরেই তারা মাথা আর কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। বন্ধ ঘরে সে শুতে পারে না। উঠে জানালাটা ফের খুলে দিতে হল তাকে। উৎকর্ণ হয়ে শুনল, বটু আর পিঙ্কির ঝগড়া থেমেছে।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে চারদিকে। হুহুংকার বাতাসে বৃষ্টির ছাঁট উড়িয়ে নিচ্ছে পর্দা, মেঝে, বিছানা অবধি ভিজে যাচ্ছে জলের ঝাপটায়। বটু চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল। বসে থাকতে থাকতে কখন একটু ঝিমুনি চলে এল মলপরা পায়ের শব্দের মতো।

আই হেট ইউ! আই হেট ইউ!

আধো ঘুমের মধ্যেই অস্বস্তি বোধ করে বটু। হেট! হোয়াই হেট মি?

আপনাকে আমার একটুও ভাল লাগে না!

বটু অস্ফুট গলায় বলল, তা হলে আমি কী করব? কী করতে পারি তোমার জন্য? বাড়ি ছেড়ে চলে যাব? আমার যে আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই!

চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিল বটু। শেষ রাতে উঠে দেখল তার ঘাড় ব্যথা করছে। কোমরটাও ধরে আছে। বাইরে বৃষ্টি থেমে

গেছে কখন যেন। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে খুব।

ঘড়িতে চারটে। বটু উঠে পড়ল।

একবার ভাবল, এই বৃষ্টিভেজা সকালে জগিং না করলেই হয়। আবার ভাবল, এই আলস্যকে একবার প্রশ্রয় দিলে সে রোজ রোজ ছুতো খুঁজবে।

জগিং-এর পোশাক পরে সে বেরিয়ে পড়ল। এখনও বাইরে কালি ঢালা অন্ধকার। লেক-এর ধারে একটা ভেজা বেঞ্চিতে বসে খানিক সময় কাটিয়ে নিল সে। পায়ের শব্দ তুলে এই ভোরে এক আধজন দৌড়বাজ দৌড়ে যাচ্ছে। পেশাদার স্পোর্টসম্যান বা খেলোয়াড়ই বেশি।

বটু উঠে পড়ল। একটু ক্লান্ত শরীরে শুরু করল তার দৌড়। প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে। তারপর আস্তে। তারপর মাঝারি এক গতিতে। শরীরের ক্লান্তি ঝরে যাচ্ছে। শরীরে নেচে বেড়াচ্ছে রক্তধারা। বেশ লাগছে এখন।

মর্নিং কাকু।

মর্নিং সুদীপ্ত।

আজ ক'রাউন্ড?

দি ইউজুয়াল। তিন।

দ্যাটস গুড। সুদীপ্ত আবছা অন্ধকার আর সামান্য কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

মেঘলা আকাশের ময়লা ছায়া পড়ে আছে জলে। এখনও আলো ফোটার সময় হয়নি। চারদিক ডুবে আছে এক আবছায়ায়। তার মধ্যেই দৌড়োচ্ছে কিছু যুবক যুবতী। আজ বুড়ো মানুষদের আনাগোনা কম। বৃষ্টির পর আজ সকালে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে। শিমুল বসু আজ আসবে বলে মনে হয় না।

তবু নির্দিষ্ট বেঞ্চটায় বসে একটু অপেক্ষা করল বটু। যতক্ষণ বাইরে থাকা যায় ততক্ষণই ভাল। বাড়ি ফিরতে অন্যান্য দিন তার অনিচ্ছে হয় না। আজ হচ্ছে। আপনাকে আমার ভাল লাগে না, 'আই হেট ইউ' বাক্যদুটি মনে মনে নাড়াচাড়া করল বটু। মানে বুঝল না। কেন, তাকে মেয়েটা এত অপছন্দ করছে কেন? একটু উদ্বেগ হচ্ছে তার। অস্বস্তি।

শিমুল বসু এল না। কিন্তু সুদীপ্ত এল। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হঠাৎ ধপ করে পাশে বসে বলল, কী কাকু, আজ একা যে!

দুর্যোগের দিন তো, বুড়ো মানুষরা তাই ভয়ে আসেনি।

আর ইউ ওয়েটিং ফর ওল্ড পারসনস?

না মানে—

আপনি— ইউ ডোন্ট লুক ওল্ড। আপনি অলমোস্ট ইয়ং। খুব বেশি হলে আর্লি ফর্টিজ বলে মনে হয়

থ্যাংক ইউ ফর দি কমপ্লিমেন্টস।

আপনি তো আশীর্বাদ অ্যাপার্টমেন্টসে থাকেন, না?

হ্যাঁ।

ওখানে আমি পরশু দিন গিয়েছিলাম। ঘ্যাম সব ফ্ল্যাট।

কার কাছে গিয়েছিলে?

রিসেন্টলি আমার এক বান্ধবীর ফ্যামিলি ওখানে উঠে এসেছে। নম্রতা মিত্র। দোতলায়।

তা হবে। আমি সবাইকে এখনও চিনে উঠতে পারিনি।

একবার ভেবেছিলাম আপনাকে একটু হ্যালো বলে আসি। তারপর ভাবলাম সেটা হয়তো ঠিক হবে না।

তা কেন? গেলেই পারতে।

আজকাল সবাই খুব প্রাইভেসি কনশাস। তাই ভাবলাম হুট করে যাওয়াটা ঠিক নয়।

বটু একটু হাসল। বলল, ইচ্ছে হলে যেয়ো।

ফ্ল্যাটে কে কে থাকে?

আমি, আমার ছেলে আর বউমা। আর একজন কাজের লোক।

নো কাকিমা?

না। তিনি মারা গেছেন।

তা হলে আপনিও একজন লোনলি ম্যান। ঠিক আমার বাবার মতো।

তোমার বাবা লোনলি কেন?

সুদীপ্ত একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি ছেলেবেলা থেকে

জেনে আসছি যে, আমার মা মারা গেছে।

বটু একটু অবাক হয়ে বলে, জেনে আসছো?

সুদীপ্ত একটু হেসে বলল, হ্যাঁ। আমাকে তাই শেখানো হয়েছিল। আসলে আমার মা আর বাবার সেপারেশন হয়ে যায়।

তা হলে তুমিও ছিলে লোনলি চাইল্ড।

সর্ট অফ। তবে আমার পড়াশুনো ছিল, বন্ধুবান্ধব ছিল, আমি বাবার মতো লোনলি ছিলাম না।

মায়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক নেই?

না। মা একদিন কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে চলে যায়। তারপর থেকে নো ট্রেস। বোধহয় মা আর কাউকে ভালবেসেছিল। লজ্জায় আর নিজের খবর দেয়নি। কিন্তু এসব হচ্ছে সেকেলে লজ্জা। আজকাল তো এসব ক্ষেত্রে ডিভোর্স হয়ে যায়। আমার কত বন্ধুর মা বাবা সেপারেটেড।

হুঁ।

আপনাকে নিজের পারসোন্যাল লাইফের কথা বলে ফেললাম। কিছু মাইন্ড করবেন না।

বটু কথাটা কানে না তুলে বলল, তোমার বাবা কেমন লোনলি?

মনে হয় ঘটনাটার শক বাবাকে কেমন যেন বদলে দিয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, অফিস থেকে এসে অন্ধকার ঘরে বসে থাকত। আমার সঙ্গে একটু আধটু কথা বলত ঠিকই, কিন্তু কোনও বন্ধু নেই, আড্ডা নেই, সিনেমা থিয়েটারে যাওয়া নেই। এমন কী বই অবধি ছুঁত না, শুধু চুপ করে বসে থাকত।

এখনও তাই?

আমি বড় হওয়ার পর থেকে বাবাকে খানিকটা জোর করে এখানে সেখানে নিয়ে যেতে শুরু করি। কখনও সিনেমায়, কখনও গঙ্গার ধারে, কখনও কলকাতার বাইরে। কিন্তু বাবা এসব এনজয় করে না। চুপচাপ বসে থাকতেই ভালবাসে। তবে ইদানীং একটা টিভি সেট কেনা হয়েছে। কেবল কানেকশনও আছে। দেখছি এখন টিভিটা দেখে।

তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাস?

বাবা ছাড়া তো আমার আর কেউ নেই তেমন। ঠাকুমা বাঁকুড়ায় থাকে, মাঝে মাঝে আসে। এক কাকাও আসে। কিন্তু কম্প্যানি তো বাবাই দেয়।

কোনও কোনও লোনলিনেস খুব উপভোগ্য কোনও কোনওটা আবার নয়।

আমার বাবার লোনলিনেসটা হয়তো বিটার। কিন্তু আমার মনে হয়, এত সেন্টিমেন্টাল হওয়ার কিছু ছিল না। বাবা প্র্যাকটিক্যাল হলে ঘটনাটা ঝোড়ে ফেলতে পারত। কেন যে পারল না। এখন আমার ভয় হয়, বাবা বেশিদিন বাঁচবে না।

শান্তভাবে বটু জিজ্ঞেস করল, বয়স কত?

পঞ্চাশ-টঞ্চাশ হবে। কিন্তু দেখে মনে হবে সত্তর। মায়ের চলে যাওয়াটা বাবা একটা পরাজয় হিসেবে নিয়েছে। আমাকে মাঝে মাঝে বলে, আমি একজন হেরো মানুষ।

বটু খুব অন্যমনস্কভাবে বলল, মে বি ইট ইজ লাভ।

লাভ? হবে হয়তো। কিন্তু এত সেনসিটিভ হওয়ারও মানে হয় না। এ যুগে কেউ এসব নিয়ে এত মাথা ঘামায়?

বটু মাথা নেড়ে বলল, ভালবাসা কাকে বলে আমিও জানি না। তাই বোধহয় আমি তোমার বাবার মতো লোনলি নই। তুমি তোমার বাবাকে আমার নমস্কার দিয়ো। হি ইজ এ বেটার ম্যান।

৪

লোকটা আবার এল আজ। এই নিয়ে বোধহয় চার দিন।

পিঙ্কির মেজাজ আজ খাট্টা। ভীষণ খাট্টা। কাল রাতে বিবাহোত্তর জীবনে এই প্রথম তার বরের সঙ্গে একটা কথা কাটাকাটি হল। পিঙ্কি জানে, দোষ সাজুর নয়। সাজু শান্ত মানুষ, সহজে মেজাজ খারাপ করে না। কাল অবশ্য সাজু একটু ইমপেশেন্ট ছিল। কিন্তু পিঙ্কি ছিল টপসি টারবি। কাল সে সকাল থেকেই ফুঁসছিল। একটা বিরক্তি আর রাগ কাল সারাদিন পিঁপড়ের মতো তার সারা শরীরে বেয়েছে। কেন, কী কারণে সেই ইরিটেশন সে বলতে পারবে না।

কাল রাতে বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই সে বলেছিল, হোয়াট এ ম্যারেজ! হোয়াট এ হেল অব এ ম্যারেজ!

বিস্মিত সাজু বলল, কী হল! হোয়াই দি অ্যাগ্রেশন?

অ্যাগ্রেশন! অ্যান্ড হোয়াই নট অ্যাগ্রেশন! একটা টিন এজার মেয়ে, কোনও লাভ অ্যাফেয়ার হল না, কোনও আন্ডারস্ট্যান্ডিং হল না, হঠাৎ তাকে ছাঁদনাতলায় পিঁড়িতে ঘুরিয়ে দেওয়া হল একটা অচেনা লোকের চারদিকে। অ্যান্ড আই মেট মাই আননোন লাইফ পার্টনার অন ফুলশয্যার বিছানা। হোয়াট এ জোক! হোয়াট দি হেল অব এ জোক!

একটু থতমত খেয়ে গেল সাজু। ফর্সা রংটা সামান্য লাল হয়ে উঠল বুঝি। বলল হ্যাঁ, সিচুয়েশনটা স্বাভাবিক ছিল না বলেই—

তার জন্য আমি কেন সাফার করছি? কেন আমাকেই বাছাই করা হল? গাঁ গঞ্জ থেকে একটা মেয়ে ধরে আনলেই তো পারতে! তাহলে আমাকে এত সাফার করতে হত না।

সাজু ডিফেন্সে চলে গেল। শান্ত গলায় বলল, তুমি তো

আপত্তি করোনি!

করেছিলাম। নিশ্চয়ই করেছিলাম। আমার আপত্তি কেউ শোনেনি। আই পি এস পাত্র বলে সবাই আত্মহারা হয়ে পড়েছিল। নাউ আই হেট ইট।

শোনো পিঙ্কি, এখন উত্তেজিত হয়ে লাভ কী? চার মাস বাদে হঠাৎ তোমার আমাকে অপছন্দ হচ্ছে?

হচ্ছে। তোমাদের সবাইকে হচ্ছে। রোজ আমার বন্ধুরা আমাকে অপমান করছে। আই হ্যাভ লস্ট মাই ফ্রিডম। আই অ্যাম লুজিং মাই হ্যাপিনেস।

সাজু বলল, বিয়েটা হয়তো আরলি হয়েছে, কিন্তু এ বয়সেও তো বিয়ে হয়।

যাদের হয় আমি তাদের মতো নই। ওঃ গড! আই অ্যাম ইন প্রিজন।

কেউ তোমাকে আটকে রাখেনি তো! ইউ আর এনজয়িং এক্সট্রিম ফ্রিডম।

ফিজিক্যালি আটকে রাখোনি ঠিকই, কিন্তু আমি আমার স্বাধীনতা হারিয়েছি। হারিয়েছি ইনোসেন্স।

সাজু একটু একটু রেগে যাচ্ছিল। বলল, তা হলে তুমি এখন কী চাও? ডিভোর্স?

হোয়াই নট?

এত তাড়াতাড়ি বিয়ে ভেঙে দিতে চাওয়ার মতো কিছু হয়েছি কি?

হয়েছে। তোমার হয়নি, আমার হয়েছে। তোমরা পুরুষেরা সমসময়েই ডোমিনেটিং, তাই তুমি টের পাওনা। আমি পাই।

চুপ করো, চুপ করো পিঙ্কি! তোমাকে কেউ বেঁধে রাখেনি। আমি কেভম্যান নই। তুমি ইচ্ছে করলে বাপের বাড়ি চলে যেতে পারো।

বাপের বাড়ি গেলেই কি আমি হারানো জীবনটা ফিরে পাব?

তার জন্য আমাদের দায়ী করছ কেন?

কেন করব না? কেন নষ্ট করলে আমাকে?

নষ্ট করেছি! অবাক কথা! বিয়ে করলে কেউ নষ্ট হয়?

হয়। বিফোর এজ বিয়ে করলে হয়।

তুমি তো বালিকাবধূ ছিলে না। আঠারো বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল।

আঠারো কি বিয়ের বয়স?

আইন তাই বলে।

আমি আইন মানি না। আমি কিছু মানতে চাই না। আই হ্যাভ বিন রুইন্ড বাই ইউ। একজন মহিলা মারা যাবেন বলে আমাকে ধরে বেঁধে তার ছেলের বউ করে আনা হবে কেন? ইজ ইট এ জোক?

আমাদের কাছে জিনিষটা জোক ছিল না পিঙ্কি। আমারও মাত্র সাতাশ বছর বয়স। এই বয়সে ছেলেরা আজকাল বিয়ে করে না। শুধু মায়ের জন্য আমাকে করতে হয়েছিল।

সেটা তোমার প্রবলেম। আমার তো প্রবলেম ছিল না। আই ওয়াজ ব্রুটলি স্যাক্রিফাইজড ফর ইওর মাদারস হুইমস।

বার বার তার মায়ের উল্লেখে রেগে যাচ্ছিল সাজু। গলা তুলে বলল, আমার মা মারা গেছেন পিঙ্কি! তাঁর সম্পর্কে রেসপেক্ট নিয়ে কথা বলা উচিত।

তিনি তোমার মা, কিন্তু আমাকে কে? আমি তো তাকে চিনতামই না।

লিভ মাই মাদার অ্যালোন, এই ঝগড়াটা তুমি তোমার মা-বাবার সঙ্গে গিয়ে কেন করে আসছ না? তাঁরা তো খুশি হয়েই তোমার বিয়ে দিয়েছেন।

আই হেট ইউ! আই হেট ইউ অল।

ঝাগড়াটা এরপর তুঙ্গে উঠল। তখন পিঙ্কি কী বলেছে আর না বলেছে তা তার এখন মনেও নেই। কিছু আনপার্লামেন্টারি কথাও নিশ্চই ছিল। এবং সাজুও কম চেঁচায়নি। ভাগ্য ভাল, কাল ঝড়-বৃষ্টির রাতে তাদের ঝগড়ার শব্দ বোধহয় বেশি দূর যায়নি।

মধ্যরাতে তাদের মিলনও হয়েছিল। তার এক অসভ্য মাসি তাকে শিখিয়েছিল, বরের সঙ্গে ঝগড়ার পর সেক্সটা খুব এনজয়েবল হয়, দেখিস। ছাই হয়। অতৃপ্তি আর অনিদ্রা নিয়ে

পাশ ফিরে শুয়েছিল পিঙ্কি। শুয়ে শুয়ে সে বুঝল, নিরীহ সাজুর দোষই নেই। সাজু তার প্রতিপক্ষ নয়। কিন্তু কে যে তার প্রতিপক্ষ সে খুঁজে পাচ্ছে না। ভোর রাতে সে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল আধো ঘুমে। বিশাল এক অন্ধকার পুরুষের আলিঙ্গনের মধ্যে শুয়ে আছে সে। অচেনা সেই বিশাল পুরুষের গায়ের তাপ ও পুরুষালি গন্ধের মাদকতা তাকে পাগল করে দিচ্ছিল। শরীরে আন চান করে উঠেছিল যেন এক গুহামানবী। সে পাগলের মতো সেই পুরুষের অন্ধকারে আরও আরও গভীরে ঢুকে যেতে চাইছিল। আর সেই সময় গুহার বাইরে একটা বাঘ ডেকে উঠল। তীব্র আশ্লেষ, তীব্র জ্বালা, তীব্র সম্মোহনের ভিতরে অবৈধ সেই অনুপ্রবেশ তাকে মাঝে মাঝে চমকে দিচ্ছিল বিবেক দংশনে।

আজ সকালে সে বড় ক্লান্ত। খিঁচটা এখনও গেল না। মনটা উল্টে পাল্টে আছে। টপসি টারবি।

সকালে আজ উঠতে দেরি হল অনেক। কেউ তার ঘুম ভাঙায়নি। পাছে চোখে আলো লাগে সেইজন্য সাজুই বোধহয় জানালার পর্দা ভাল করে টেনে দিয়ে গেছে। ক্লান্ত শরীরে উঠে সে দেখল, বাড়িতে কেউ নেই। সাজু বেরিয়ে গেছে অফিসে। কর্নেল সাহেব তার প্রাতর্ভ্রমণ থেকে ফেরেনি। ধরম বাজারে।

চটপট সকালের প্রস্তুতি সেরে নিল পিঙ্কি। আজ তার নিজেকে প্রচণ্ড খাটাতে হবে। এরকম ডুবন্ত মন আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে বেঁচে থাকা যায় নাকি? ফ্রি হ্যান্ড সেরে সে আজ তার স্ট্যাটিক সাইকেলে চেপে সবচেয়ে বেশি প্রেশারে প্যাডল করতে লাগল।

এই সময়ে লোকটা এল। ডোরবেল বাজতেই পিঙ্কির একটা হার্টবিট মিস হল। কেন কে জানে? কর্নেল সাহেব ফিরেছে ভেবে সে গিয়ে সটান দরজা খুলে দেখে, খুনির মতো দেখতে সেই লোকটা। বেঁটে খাটো গাট্টাগোট্টা চেহারা। দুখানা চোখ পলকহীন এবং শীতল।

এক মাস আগে লোকটা প্রথম আসে। এরকমই এক সকালবেলা। ঘরে ঢুকতে দেওয়ার মতো চেহারা বা পোশাক

নয় বলেই সাজু দরজায় দাঁড়িয়েই কথা বলেছিল। লোকটার বক্তব্য ছিল, সে বিজয় নগর গ্রামে থাকে। তার ছোট ছেলেকে পার্টির লোকেরা মেরে দিয়েছে। সে আর তার বড় ছেলেকেও খুঁজছে তারা। সে ছেলেকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে রয়েছে। গ্রামে তার বউ, মেয়ে আর ছেলের বউ পড়ে আছে। সে গাঁয়ে ঢুকতে পারছে না। পুলিশকে সে খুনিদের নাম বলা সত্ত্বেও পুলিশ কিছুই করছে না। তার রুজি রোজগার বন্ধ। ইত্যাদি। লোকটা সেদিন কথা বলতে বলতে কাঁদছিল।

সাজু তার নাম ধাম লিখে নিয়ে অফিসে দেখা করতে বলে ছেড়ে দেয়।

দিন সাতেক বাদে লোকটা ফের এলে সাজু খুব বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি বাড়িতে আসবে না। বাড়িতে আসাটা নিয়ম নয়। দেখা করতে হলে অফিসে করবে। যেটুকু জেনেছি, তোমার ছোট ছেলে তো ক্রিমিনাল ছিল। ডাকাতি আর খুনের রিপোর্ট আছে তার নামে।

হাতজোড় করে লোকটা বলল, আমার ছেলেটা ভাল ছিল না, ঠিক কথা। কিন্তু তা বলে মেরে দেবে কেন বলুন। রোজগেরে হেলে, আমার সঙ্গে চাষবাস দেখত।

সাজু বিরক্ত হয়ে বলল, তাকে তো মেরেছে তার পার্টিরই লোক। যখন পার্টিতে ঢুকেছিল তখন তো পুলিশের তোয়াক্কা করোনি।

আজ্ঞে বাবু, জান বাঁচাতে পার্টি আমাদের করতেই হয়।

তা হলে এখন পার্টির কাছে যাও।

পার্টি আমাদের কথা শুনতে চাইছে না। বুচুবাবুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। ওরে বাবা! টং হয়ে আছেন।

আমি যেটুকু খবর পেয়েছি তাতে বলা হয়েছে, তুমি বাসুদেব মিদ্দার—তুমিও একজন ক্রিমিনাল। ডাকাতি আর খুনের অনেক কেস আছে তোমার নামে। পার্টি করতে বলে গা বাঁচিয়ে ছিলে।

ও সব মিথ্যে কথা বাবু। পুলিশ কেস সাজিয়েছে।

পুলিশকে যদি তোমার বিশ্বাস না-ই হয় তা হলে আমার

কাছে এসেছ কেন? আমিও তো পুলিশ।

আপনি যে পুলিশের বাবা।

পার্টির সঙ্গে তোমাদের লাগল কেন?

পঞ্চায়েত ইলেকশনের সময় কী একটু হয়েছিল। বুচুবাবুর কাছে আমাদের নামে লাগাল। উনি আমাদের কথা কানে তুললেন না। রাত্রিবেলা হামলা হল। বড় ছেলে আর আমি পালালাম। ছোটটা পারল না।

যা করার লোকাল থানাই করবে। আমি বলে দিয়েছি। যাও।

দিন পনেরো বাদে লোকটা আবার এল।

সাজু ভীষণ রেগে গেল লোকটাকে দেখে, তুমি আমার বাড়িতে এসে হানা দিয়েছ।

আপনার দফতরে যে ঢুকতে দিচ্ছে না বাবু। হটিয়ে দিচ্ছে বার বার।

আমার দফতরেই বা তোমার কী কাজ? বলেছি তোমার জন্য যা করার লোকাল থানাই করবে।

কিছু করছে না বাবু, গতকালও গিয়েছিলাম। ছোটবাবু খিস্তি দিয়ে বললেন, বড় গাছে নাও বাঁধতে গিয়েছিলে শালা, লাথি মেরে শিরদাঁড়া ভেঙে দেবো। এস ডি পি ও তোমার হাতে তামাক খাবে ভেবেছ? ওরা কিছু করবে না বাবু। আমার ধান টান সব লুটপাট হয়ে গেছে। বুচুবাবু শাসাচ্ছে পুলিশ কিছু করলে আমার ঘরে আগুন দেবে। আপনি কিছু করুন বাবু।

ভীষণ রেগে গেল সাজু। লোকটাকে সিঁড়ি দেখিয়ে বলল, এখনই যদি চলে না যাও তোমাকেই আমি অ্যারেস্ট করব। নিজেরা যখন লোকের ওপর হামলা করতে তখন এত ভয় কোথায় ছিল? এখন যাও, পুলিশ যা করার করবে। আমার কাছে এসে লাভ নেই।

সাজুর পিছনে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখেছিল পিঙ্কি। সাজুর ওই ধমক খেয়ে লোকটা ঠিক ভয় পেল না। শীতল পলকহীন চোখে সাজুর দিকে অন্তত দশ সেকেন্ড তাকিয়ে রইল। সাজুর তর্জনী দশ সেকেন্ড ফ্রিজ হয়ে রইল সিঁড়ির দিকে। দশ সেকেন্ড যেন এক অনন্তকাল। তারপর লোকটা মুখ ফিরিয়ে

নেমে গেল।

দরজা বন্ধ করে সাজু পিঙ্কির দিকে চেয়ে বলল, এ ডাউন রাইট ক্রিমিনাল।

পিঙ্কি সামান্য উদ্বিগ্ন হয়েছিল। লোকটা কেমন একটা কঠিন চোখে সাজুর দিকে চেয়ে ছিল। চোখটা ভাল নয়। সে বলল, ক্রিমিনাল হলে জেলে দিচ্ছ না কেন?

পলিটিক্যাল শেলটার ছিল বলে পুলিশ কিছু করতে পারেনি। আর ধরবেই বা কাকে! এক একটা গাঁ আছে যেখানে এইট্টি পারসেন্ট লোকই ক্রিমিনাল। দিনে চাষ বাস করে, রাতে চুরি-ডাকাতি-খুন।

লোকটা কী চাইছে?

মামা বাড়ির আবদার করতে এসেছিল।

ঘটনাটা এইখানেই থেমে ছিল। কিন্তু লোকটাকে ভোলেনি পিঙ্কি। ওই খুনি চোখ কি ভোলা যায়? তাই আজ দেখেই হঠাৎ চমকে গেল পিঙ্কি। তারপর রাগের গলায় বলল, কী চাই?

লোকটা একটা নমস্কার করে বলল, আপনার কাছেই আসা বউদি।

পিঙ্কি একবার ভাবল দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু আবার এও মনে হল, সেটা বড্ড বেশি ভয়-পাওয়া হয়ে যাবে। সে তো একজন জবরদস্ত আই পি এস অফিসারের বউ!

কেন, আমার কাছে কী দরকার?

আমার নাম বাসুদেব মিদ্দার। বিজয় নগর গাঁয়ে বাড়ি। পার্টির লোকেরা আমার ছোট ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে। গাঁয়ে ফিরলে আমাকে আর আমার বড় ছেলেকেও মারবে। আমি বিপদে পড়ে এসেছি। বাবু নিজে কেসটা হাতে নিলে আমি বেঁচে যাই।

লোকটা ক্রিমানাল—সাজুই তাকে বলেছিল। খুনটুন করেছে। তা সত্ত্বেও বারণ না মেনে বাড়িতে হানা দিচ্ছে, এরকমই কি জীবন হবে পিঙ্কির? মাঝে মাঝে ডোরবেল বাজিয়ে যত ক্রিমানাল এসে উদয় হবে?

কাল থেকে মেজাজ খাট্টা, রাতের ঝগড়া এবং ক্লান্তি

মিলেমিশেই বোধহয় দপ করে মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। চিৎকার করে উঠল, স্কাউন্ড্রেল, গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার।

লোকটা ইংরিজি বুঝল না, কিন্তু নির্দেশটা বুঝল। তবু জেদি গোঁয়ার লোকটা বলতে চেষ্টা করল, বউদি, আপনি বাবুকে বলে দিলে কাজটা হয়—

পিঙ্কি চেঁচাল, আমি কিছু শুনতে চাই না, গেট আউট আই সে ; চেঁচামেচিতেই বোধহয় উল্টো দিক আর বাঁ পাশের আর দুটো ফ্ল্যাটের দরজা খুলে কয়েকজন নারী পুরুষ বেরিয়ে এল।

ক্যা হুয়া ?

কী হয়েছে?

এত লোক দেখেও কিন্তু বাসুদেব মিদ্দার তেমন ভয় খেল না। শুধু বলল, কথাটা শুনলেও পারতেন বউদি। মতলব কিছু খারাপ ছিল না।

পিঙ্কি চিৎকার করে বলল, ফের এই বাড়িতে এলে খুব খারাপ হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি। এটা পুলিশের চৌকি নয়, ভদ্রলোকের বাড়ি। যাও।

আর একবার শীতল পলকহীন খুনির চোখে তার দিকে একটুখন চেয়ে থেকে বাসুদেব মিদ্দার নেমে গেল।

দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল পিঙ্কি, লিফট এসে থামল এবং কর্নেল বটকৃষ্ণ রায় বেরিয়ে এল।

পিঙ্কি জানে না তার হার্টের কোনও অসুখ হয়েছে কি না। মাঝে মাঝে একটা হার্টবিট মিস হয়ে যায়। যেমন এখন হল।

শ্বশুর চারদিকে লোকজন এবং দরজায় পিঙ্কিকে দেখে একটু অবাক হয়ে পিঙ্কিকেই জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে বৌমা?

আপনি ভিতরে আসুন।

বটু ঢুকতেই দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করল সে। তারপর মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, প্লিজ! আপনি আমাকে বৌমা ডাকবেন না। ওই ডাকটা আমার ভীষণ খারাপ লাগে। পিঙ্কি বলে ডাকবেন।

বটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বলল, ও।

ঝাঁঝালো গলায় পিঙ্কি বলল, এ বাড়িটার কোনও সিকিউরিটি নেই। দারোয়ানরা কী করে বলুন তো! কেন যাকে তাকে ওপরে উঠতে দেয়?

কে এসেছিল?

একজন খুনি বদমাশ, আমি ফ্ল্যাটে একা ছিলাম, একটা কিছু হতেও পারত।

বটু আগন্তুক সম্পর্কে আর কোনও কৌতূহল প্রকাশ করল না। শুধু ঠাণ্ডা গলায় বলল, ঠিকই তো। দাঁড়াও আমি দেখছি।

বটু বেরিয়ে গেল।

খাওয়ার টেবিলে এসে চুপচাপ বসে রইল পিঙ্কি। তার আজ শরীর খারাপ লাগছে, যা তার কদাচিৎ লাগে। এ বাড়িতে নীচের সিকিউরিটি গার্ডদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য ইন্টারকম টেলিফোন বসানো রয়েছে, কিন্তু কোনও কারণে তা চালু হয়নি এখনও। দারোয়ানরা তাই সবাইকে ছেড়ে দেয়। এটা একটা হাটের মতো বাড়ি হয়ে আছে।

মিনিট কয়েক বাদে বটু এল।

ভয় পেয়ো না। লোকটা আর ওপরে আসবে না।

আজ খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই বলে পিঙ্কি একটু ঘোল খেয়ে নিচ্ছিল। শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলল, ধরম বাজারে গেছে। আমি কি আপনাকে জলখাবার করে দেব?

না, তার দরকার নেই। আমি স্নান টান করব, দেরি হবে। তোমার সময় হয়ে থাকলে তুমি আসতে পারো।

ঘোলটা শেষ করে পিঙ্কি উঠল। সে আজ বেরোতে একটু ভয় পাচ্ছে। লোকটা রাস্তায় ওত পেতে নেই তো? অবশ্য কলকাতার রাস্তায় ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এত লোক।

স্নান করে আজ একটা হালকা ক্রিম রঙের চুড়িদার পরল পিঙ্কি। ব্যায়ামের জন্য শর্টস আর টি শার্ট ভরে নিল ব্যাগে। বেরিয়ে পড়ল। শ্বশুরবাড়িতে তার অখণ্ড স্বাধীনতা। এর জন্যই সে বাপের বাড়িতে থাকার চেষ্টা করেনি। সেখানে বেরোনোর আগে অন্তত চার পাঁচ জনকে বলে তারপর বেরোতে হবে। তা ছাড়া যা খুশি ড্রেস করে বেরোবার উপায় নেই।

মিনিবাসে উঠে আজও দাঁড়াতে হল। আজও আয়নায় মুখ দেখল সে। নিজের মুখ নিজে কিছুতেই বিচার করা যায় না। তার মুখে বিষণ্ণতা বা ক্লান্তি ফুটে আছে কিনা কী করে বুঝবে সে?

খুবই আকস্মিক ভাবে মিনিবাসের হালকা ভিড়ের মধ্যে একজোড়া চোখ আয়নায় দেখতে পেল সে। নিজের অজান্তেই আর্ত চিৎকার করে উঠেছিল প্রায়। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিল। কিন্তু বুকটা ধক ধক করছে ভয়ে আর উত্তেজনায়। বাসুদেব মিদ্দার মিনিবাসের পিছনে দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে আছে।

পিঙ্কি কি চেঁচাবে? লোককে ডেকে কি বলবে, ওই দেখুন, ও লোকটা আমাকে ফলো করছে? কিন্তু সেটা একটা অতিনাটকীয় ব্যাপার হবে। জনসাধারণ যদি লোকটাকে পাকড়াও করে এবং পেটায় তা হলেই যে বাসুদেব নিরস্ত হবে এমন নয়।

পিঙ্কি সুতরাং স্থির রইল। রাসবিহারীর মোড় বেশি দূরও নয়। তবু রাস্তাটা আজ ফুরোতে চাইছে না।

স্টপে নেমেই পিঙ্কি দ্রুত স্টেশনে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। দশটা চারের গাড়িটা সে হয়তো ধরতে পারবে। এক ঝলক পিছু ফিরে দেখে নিল সে। বাসুদেব মিদ্দারকে দেখা যাচ্ছে না।

প্রায় দৌড়ে নেমে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে চাতালটা পার হল। আটচল্লিশ রাইডের টিকিটটা বের করতে গিয়ে প্রথমে ব্যাগের চেনটা একবারে খুলতে পারল না। আজ টিকিটটাও হাতড়ে পাচ্ছিল না কিছুতেই। তারপর বাধা হল প্লাস্টিকের কভার থেকে টিকিটটা বের করতে গিয়ে। ততক্ষণে ট্রেন ঢুকে পড়ল, থামল এবং ঘোষণাও শোনা গেল, দরজা বন্ধ হচ্ছে। দরওয়াজা বন্ধ হো রহা হ্যায়। ডোরস আর ক্লোজিং।

শেষ সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে সে দেখল ট্রেন ছেড়ে যাচ্ছে। এবং মুখ ফিরিয়ে দেখল গেট-এর ওপাশে বাসুদেব মিদ্দার দাঁড়িয়ে তার শীতল খুনির চোখে তার দিকে চেয়ে

আছে।পিঙ্কির শরীর হঠাৎ ভয়ে শক্ত হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর স্টেশনে লোক থাকে না। এক দুই মিনিট পর একে একে লোক আসে। কিন্তু এই এক দুই মিনিটের নির্জনতাই ভয়ঙ্কর।

পিঙ্কি প্ল্যাটফর্মে নামল না। দাঁড়িয়ে রইল। এখান থেকে বুকিং অফিসটা দেখা যাচ্ছে। দু একজন টিকিট কাটছে। এ জায়গাটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ।

৫

দুটো আলুথালু চোখ আকুলভাবে তার ভিতরে বোধহয় তাকেই খুঁজছিল। সেই ছ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা? সেইরকমই মেদহীন? তেমনই ভারোত্তোলকের মতো দুখানা কাঁধ? তেমনি নাবাল জমির মতো মেদহীন মধ্যদেশ? না আরও কিছু? বারো বছর আগে এমনই এক জোড়া বিহ্বল চোখ তাকে আবিষ্কার করেছিল। জনান্তিকে ক্ষণকালের কয়েক মুহূর্তে তার চোখে চোখ রেখে বলেছিল, হোয়াট এ ম্যান! হোয়াট এ ম্যান ইউ আর!

বারো বছর সময় কিছু তটরেখা ফেলে যায়নি কী? বারো বছর ধরে স্মৃতিতেও পড়েছে অনেক ধুলো। তাই অপরাজিতা খুঁজছিল তাকে। তার মধ্যে তাকে।

বটু হঠাৎ নিচু স্বরে প্রশ্ন করল, পেলেন?

অপরাজিতা উন্মুখ হয়ে প্রশ্ন করল, কী?

যাকে খুঁজছেন আমার মধ্যে!

অপরাজিতার মুখে ক্ষীণ হাসি আর রক্তাভা। ফর্সা মেয়েরা সহজেই লাল হয়।

আপনি একটুও বুড়ো হননি তো!

সামনের যুবতী সদৃশ মধ্যচল্লিশ অপরাজিতাও নিজেকে সযত্নে সতর্কতায় রেখেছে। ওজন উনিশ বিশ বেড়ে থাকতে পারে। আর চুলের ঢল নিশ্চয়ই আগের মতো নেই। মেয়েরা আজকাল বয়সের সঙ্গে লড়াই করতে জানে। যোগব্যায়াম, মাসাজ, কসমেটিক সার্জারি, হেল্‌থ্‌ ফুড, মেডিটেশন এবং রূপটান।

একটা বাসন্তী রঙের তাঁতের শাড়ি পরেছে অপরাজিতা, আর তাতেই উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। ঢলঢলে দুখানা

স্বপ্নময় চোখে চেয়ে বলল, কত বার দেখতে ইচ্ছে হয়েছে! কতদিন পরে দেখা!

বটু অস্বীকার করতে পারে না, বারো বছর আগে মাত্র একটি দিনের দেখা, তবু উত্তর ত্রিশের এই স্ত্রীলোক, তার স্ত্রীর বান্ধবী, একটা মোচড় দিয়ে গিয়েছিল তাকে। সুন্দরী? না, সুন্দরী বটু বিস্তর দেখেছে। বটুর প্রতি স্ত্রীলোকদের আকর্ষণও ছিল কম নয়। কিন্তু এর নিবেদন ছিল অন্যরকম। কয়েক পলকের মধ্যে যেন হারিয়ে বসেছিল নিজেকে। ভাগ্যিস আর দেখা হয়নি।

বটু মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

কয়েক মিনিটের একটা সম্মোহনকারী আবহের মধ্যে বসে থাকল তারা। স্মৃতি-বিস্মৃতিময় এক রূপকথার মতো রচিত হল আবহ। তারপর ডোরবেল বাজল। আর খান খান হয়ে কাচের মতো ভেঙে গেল আবহটা।

ঘরে ঢুকল মরূদ্যান দাশগুপ্ত। লম্বা—খুব লম্বা কোলকুঁজো মানুষ। রোগাটে গড়ন। কিন্তু পেটে ফুটবলের মতো চর্বির স্তূপ।

এই আমার হাসব্যান্ড।

মরূদ্যান খুশিয়াল গলায় বলে উঠল, এসে গেছেন! সরি ফর দি ডিলে, আমার্কে অপুই ঠেলে পাঠাল আপনার জন্য মাশরুম আনতে। কিন্তু ধারেকাছে কোথাও পাওয়া গেল না। সেই লাউডন স্ট্রিট অবধি যেতে হল।

মাশরুম বটু খায় বটে, কিন্তু তত প্রিয় কিছু নয়। বরং তার মনে হল, প্রথম দেখার মুহূর্তটায় আর কেউ থাকুক তা চায়নি বলেই অপরাজিতা মাশরুমের অছিলায় স্বামীকে সরিয়ে দিয়েছিল।

মরূদ্যান বলল, আমি ছ ফুট তিন। আপনি?

ছয় এক।

আমি অবশ্য লম্বাটাই ছিলাম, শরীরের জন্য আর কিছু করিনি। পড়াশুনো আর কাজকর্ম। নো ফিজিক্যাল ফিটনেস। বাট ইউ লুক লাইক এ কেভম্যান। রাফ অ্যান্ড টাফ। বসুন, আসছি।

মরূদ্যান ভিতরে গেল পোশাক পাল্টাতে।

দুটো চোখে নিষ্পলক ও নির্লজ্জের মতো তার দিকে চেয়ে থেকে অপরাজিতা বলল, আমাকে আপনার মনেই ছিল না।

ছিল। কিন্তু কোনও কমিউনিকেশন না থাকাতে—

কমিউনিকেশনও ছিল। আমি মাঝে মাঝে সুস্মিতাকে চিঠি লিখতাম। তাতে আপনার কথাও থাকত। তবে সুস্মিতা চিঠি পেত অনেক দেরিতে।

হ্যাঁ, চিঠি সেনসর হয়ে আসত।

অত দেরি হত বলে চিঠি লেখার ধৈর্য হারিয়ে যেত। কিন্তু আপনার কথা কিন্তু আমি কখনও ভুলিনি। আপনি আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

এ সবের জবাব কেমন হওয়া উচিত তা বটু জানে না। এ একটা মেয়েলি দাবিদাওয়ার মতো। ভুলে যাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেটা বললে দুঃখ পাবে।

পায়জামা পাঞ্জাবি পরে এসে মরূদ্যান বসল।

কর্নেল রায়, সত্যিই একটুও ড্রিংক করবেন না? স্কচ ছিল।

আপনি খান। আমি কয়েকবার চেষ্টা করে দেখেছি। পেটে ভীষণ ব্যথা হয়।

আশ্চর্য! মদ খেলে কারও পেটে ব্যথা হয় বলে শুনিনি।

অপরাজিতা একটু ঝংকার দিয়ে বলল, আজ ড্রিংক থাক। ওঁর সম্মানে আজ তুমিও খাবে না।

মরূদ্যান তটস্থ হয়ে বলল, আরে না, আমি তো অকেশন্যাল ড্রিংক করি।

আহা! কী সাধু! যেদিন খাও সেদিন তো পাগল হয়ে যাও।

মরূদ্যান একটু ডিফেনসিভ হাসি হাসল। বলল, হ্যাঁ, যেদিন খাই সেদিন চৌকাঠ ডিঙিয়ে যাই। ওপাশে একটা রূপকথার রাজ্য। সেটায় ঢুকে পড়তে না পারলে মদ খাওয়াই বা কেন?

চোরা চোখ বার বার হানা দিচ্ছে তার ওপর। ঝাঁপিয়ে পড়ছে। হামলা করছে। একজোড়া চোখ এই বয়সেও এত পারে! ইংল্যান্ডবাসিনী হয়তো তার কাছেও এটুকুই চায়। চোখের লেহন, পরস্পরকে অবাস্তব ভাবে চাওয়া। এটুকুই

হয়তো কৌটায় পুরে রেখে দেবে টমেটো। একটু একটু করে নির্জনে বিরলে একা বসে আস্বাদন করবে।

আমরা পুরী যাচ্ছি। চলুন না আমাদের সঙ্গে।

অবাক হয়ে বটু অপরাজিতার দিকে চেয়ে বলল, আমি!

কেন, আপনার তো আর কোনও কাজ নেই। সুস্মিতার কথা কিছুদিন ভুলে থাকতে পারবেন।

প্রস্তাবটা যে খুব অবাস্তব তা নয়, তবু বটুর মনে হচ্ছিল এ এক অদ্ভুত প্রস্তাব। সে মাথা নাড়ল, না, তা হয় না।

আমরা গাড়ি করেই তো যাব। কোনও অসুবিধে হবে না।

মরূদ্যান মৃদুস্বরে বলল, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। শোকেতাপে সী-সাইড হচ্ছে আইডিয়াল জায়গা। বিশাল সমুদ্র আর আকাশ মানুষকে অনেক কিছু ভুলিয়ে দেয়।

একটা দুষ্টু হাসি খেলা করছে অপরাজিতার ঠোঁটে। চোখে ঝিকিমিকি। তাকে নিরস্ত্র করে একেবারে কোণঠাসা করে ফেলেছে টমেটো। বটু প্রতিরোধহীন। পুরীর সমুদ্রের ধারে নির্জন সৈকতে তিনজন। যে কোনও অজুহাতে একজনকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে দেবে কি ইংল্যান্ডবাসিনী! তারপর কী হবে? বিস্ফোরণ? বেলা যায়, বেলা যায়, এই বেলা তুলে নাও জীবনের যা কিছু পড়ে থাকা ফসল! তাই চায় ইংল্যান্ডবাসিনী? ওর চোখ টরেটক্কায় সেই বার্তাই কি পাঠাচ্ছে বটুকে? ঝোড়ো বাতাস আর উতরোল ঢেউয়ের মাঝখানে এ কীসের আমন্ত্রণ?

একজন সৈন্য যুদ্ধ জয়ও করে না, হেরেও যায় না। সে আদেশ পালন করে মাত্র। গুলি উড়ে আসে, বোমা নামে, মৃতদেহের স্তূপের ওপর দিয়ে সে চলে। তাকে যেতেই হয়, কারণ তাকে চালায় এক আদেশ।

হঠাৎ অর্ধস্ফুট গলায় বটু বলল, বাট দেয়ার ইজ এ কম্যান্ড। দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ কম্যান্ড!

মরূদ্যান ঝুঁকে বলল, কিছু বলছেন?

এই সেই লিকেজ, যা হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে আসে। বটু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, টু ইজ কম্পানি, থ্রি ইজ ক্রাউড।

মরূদ্যান হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, আরে দূর মশাই, আমাদের কি আর সেই বয়স আছে! ইউ উইল বি এ নাইস কম্প্যানি।

পুরী তাকে হাতছানি দিচ্ছিল না। বটু জানে, তাকে হাতছানি দিচ্ছে টমেটো। নিজেকে সংবরণ করে বটু বলল, এবার থাক। কিছু প্রবলেম আছে। পরের বার না হয়—

খাওয়ার পর যখন মরূদ্যান বাথরুমে গেছে তখন খুব কাছাকাছি—প্রায় বুকের কাছে মুখ এনে চোখ তুলে বটুর চোখে রেখে করুণ গলায় অপরাজিতা বলল, কেন গেলেন না পুরীতে? কত কথা ছিল আপনার সঙ্গে! আর কবে দেখা হবে কে জানে!

বটু মৃদু স্বরে বলল, দেখা হবে।

পরের বছর আমরা ঠিক এ সময়ে আসব। আজকাল খুব কলকাতায় আসতে ইচ্ছে করে। পরের বার কিন্তু ছাড়ব না। মনে থাকবে?

থাকবে।

আর কিন্তু বুড়ো হবেন না। এখানেই থেমে থাকুন। ঠিক যেন এরকমই দেখতে পাই পরের বার এসে। মনে থাকবে?

থাকবে।

চিঠি দেব। জবাব দেবেন তো!

দেব।

আমি কিন্তু শুধু আপনার টমেটো। ও নাম আর কারও জন্য নয়।

বলতে বলতে অপরাজিতা বটুর টি শার্টের একটা খোলা বোতাম সযত্নে লাগিয়ে দিল। বটু জানে, বোতামটা লাগানো থাকলে অপরাজিতা সেটা খুলে দিত। এই স্পর্শটুকু ওর দরকার ছিল বোধহয়। কত তুচ্ছের ভিতর দিয়ে মানুষ কত কী পেয়ে যায়।

'আর কিন্তু বুড়ো হবেন না' এই কথাটা সারাক্ষণ কানে বাজছিল বটুর। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে মধ্যরাত অবধি

বারবার এই কথাটাই তার তন্দ্রা ভেঙে দিচ্ছিল।

কত বার যে পাশ ফিরল বটু তার হিসেব নেই।

জীবন জুড়ে দুলছে সাপের ছায়া। জীবন-প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায়—অপরাজিতা, ফিরাব কেমনে? পাথর থেমে থাকে, থেমে থাকে জড়বস্তুরা। মানুষ কি তা পারে? এক বছর পর আমি আর একটু বুড়ো হয়ে যাব।

দুধারে অতল খাদ, গিরিশিরা দিয়ে খাড়াই কাঁচা রাস্তা বেয়ে তীব্র ঘর্ঘর শব্দ করতে করতে ঝাঁকুনি দিয়ে চলেছে একটা গাড়ি। নাটবল্টুর শব্দ, ডিজেলের গন্ধে ওষ্ঠাগত প্রাণ। সামনে কুয়াশার ঘন আস্তরণ। গাড়ি তবু চলেছে। কোথায় যাচ্ছে প্রশ্ন করে লাভ নেই। একটি আদেশ চালায় তাদের। অমোঘ অলঙ্ঘ্য আদেশ। দুটো ভয়ঙ্কর মোড় ফিরল গাড়ি। রাস্তা সরু থেকে আরও সরু হয়ে আসছে। ড্রাইভার ওমপ্রকাশ দাঁতে দাঁত চেপে বলল, চাকা ঝুলছে সাহেব। গাড়ি টাল খাচ্ছে।

বটু বলল, তবু চলো।

হাঁ সাব। সামনে আর একটা এলবো টার্ন আছে। ওই টার্ন পেরোবে না গাড়ি। হোয়ার উই আর গোয়িং সার?

নো হোয়্যার।

বহুৎ আচ্ছা।

আশ্চর্য। সেই অসম্ভব সরু গিরিশিরার তীক্ষ্ণ মোড়টিও ঝুলতে ঝুলতে পেরিয়ে গেল গাড়ি। উঠছে। আরও খাড়াই বেয়ে উঠছে। দু ধারে গভীর খাদে মেঘের স্তূপ জমে আছে। এখটা সরু নদী সুতোর মতো দেখা যাচ্ছে চকিতে কখনও।

নো মোর পাথ সার।

পথ শেষ। সামনে খাদ, দুপাশে খাদ। কোথাও যাওয়ার নেই আর। গাড়ি থেমে আছে।

ওমপ্রকাশ মৃদুস্বরে বলল, ক্যারেড আউট দি অর্ডার সার।

হ্যাঁ।

ফেরার কোনও প্রশ্ন নেই। গাড়ি ঘোরানো যাবে না ইহজন্মেও।

আব কিয়া?

জাস্ট ওয়েট টিল দি নেক্সট অর্ডার।

ইউ উইল নেভার কাম সার।

আই নো।

ভোরের স্বপ্ন। আজকাল ভোরের দিকে ঠাণ্ডা পড়ে বেশ। বটু উঠে ফের চাদরটা গায়ে টেনে শুতে যাচ্ছিল। ঘড়ি দেখে আর শুল না। উঠে পড়ল। আজ ক্লান্ত হওয়ার জন্যই অন্ধকার লেক-এর জনহীন ধার দিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ জোরে এবং আস্তে জগিং করল বটু। মাত্র সাড়ে চারটে। এখনও ভ্রমণকারী বা দৌড়বাজরা বেরোয়নি। পরিষ্কার আকাশে ঝলমল করছে নক্ষত্ররাশি। এক ধারে ঢলে আছে ক্ষয়া চাঁদ।

ভোরের ফাঁকা বেঞ্চে যখন ক্লান্ত বটু বসে আছে তখন তার নিজস্ব গোধূলি থেকে নেমে এল সুস্মিতা।

চোখ পাকিয়ে বলল, কী হচ্ছে এ সব? আমি যে সব দেখতে পাই।

একটু মাথা নেড়ে বটু বলল, চোখ থাকতে দেখলে না?

কী দেখার ছিল? ছিল কিছু?

বারো বছর আগে মাত্র একদিন দেখা। তোমার চোখের সামনে ঘটে গিয়েছিল কত কিছু। সব কি দেখা যায়?

আমাকে বলোনি তো কখনও?

বলতে নেই যে!

কী হয়েছিল তোমাদের মধ্যে? শরীরের কিছু?

না। শরীরের চেয়ে মন বেশি পাপী।

ও মা গো! সে তো মাত্র দু-তিন ঘণ্টার দেখা। তাতেই?

মাঝে মাঝে ওরকম ঘটে যায়।

সে জানি। কিন্তু তুমি তো কখনও মেয়ে দেখলে গলে পড়োনি। আমার খুব বিশ্বাস ছিল তোমাকে। তুমি ওরকম নও।

ঠিক কথা। আমি ওরকম নই। তবু দু-একবার তোমার অজান্তে কিছু কি ঘটেনি?

কী ঘটেছে? বলো আমাকে।

একজন আয়া ছিল আমাদের। সুর্মা। মনে আছে?

হ্যাঁ। সাজু খুব ছোটো বলে রেখেছিলাম। কী হয়েছিল

বলো!

সে আমাকে হাঁ করে গিলত। যেখানে আমি সেখানেই তার চোখ।

মর ছুঁড়ি! বলোনি তো!

বললে কী হত? তাকে তাড়িয়ে দিতে। আমি সেটা চাইনি। একজোড়া চোখ আমার পৌরুষকে সবসময়ে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে, খারাপ কী?

কী হল বলো!

তোমার শরীর খারাপ ছিল। একটা ইনফেকশনে ভুগছিলে। আমি আলাদা শুতাম। ইট হ্যাপেন্ড দেন।

কোথায় যাব মাগো! তুমি এত খারাপ! আর?

গুনলে আরও পাঁচ-সাতটা। ডিটেলসে দরকার কী? এ রকম তো হয়।

বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! কোনও দিন মনে হয়নি তো যে তুমি এ সব পারো!

সুরেকাকে মনে আছে? ব্রিগেডিয়ার সুরেকা?

কেন থাকবে না?

তার বাড়িতে একদিন গার্ডেন পার্টি চলছিল। হুল্লোড়ের এক শেষ। সুরেকা আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা নতুন জিনিস দেখাচ্ছিল। একটা নতুন আমদানি পাওয়ারফুল ইনফ্রা রেড বাইনাকুলার। আগের মডেলের চেয়ে অনেক বেশি সফিস্টিকেটেড। আমি বাইনাকুলারটা নিয়ে ঘরের বাইরে এসে বাগানের আলো আঁধারিতে মানুষজন দেখছিলাম। বেশির ভাগ লোকই তখন মাতাল এবং বেসামাল। তুমি আর লেফটেন্যান্ট কর্নেল পাভামনি ছিলে বাগানের সবচেয়ে রিমোট একটা কোণে। সেখানে বাতির নামগন্ধ ছিল না। একটা ঘন ঝোপের ওপাশে। আমি পজিশন নিয়ে তোমাদের দেখতে পাই। পাভামণি তোমাকে—বলব?

থাক।

থাকল।

কিছু বলোনি কেন?

দরকার ছিল না। জানতাম ওটা ফ্রিল বেনিফিট।

তোমার পৌরুষে লাগেনি?

লেগেছিল। পৌরুষ পারে উপেক্ষা করতেও।

আমার আজকাল একটা কথা মনে হয়।

কী?

তোমার আর আমার মধ্যে কখনও ভালবাসা ব্যাপারটাই ছিল না।

না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে রোমান্স থাকে না।

তা হলে কী ছিল?

বলা মুশকিল।

ভালবাসা ছাড়া আমরা একসঙ্গে এতদিন ছিলাম কী করে?

ভালবাসা ছাড়াও কত লোক একসঙ্গে থাকে। আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তো চমৎকার ছিলাম।

তুমি কখনও আর কাউকে ভালবাসতে? অন্য কোনও মেয়েকে?

না।

বাসতে। আমি কখনও তোমাকে ধরতে পারিনি। এই তো বললে বারো বছর আগে অপরাজিতার সঙ্গে তোমার—

না। নদী এত সহজে খাত বদলায় না।

তার মানে?

জীবনের মূল গতি এইসব ছোট ছোট ডাইভারশনে প্রভাবিত হয় না।

তোমার বয়স এখন কত জানো?

জানি।

বুড়ো হতে চললে, তবু কেন অপরাজিতা তোমার টি শার্টের বোতাম আটকায়? তোমার মনে পাপ না থাকলে—

ওই স্পর্শের মধ্যে যে বিদ্যুৎ ছিল তা কোনও স্বামী-স্ত্রীর স্পর্শের মধ্যে থাকে কি?

তা বলে—

শোনো সুস্মিতা, আমি তোমার কাছে কখনও লেফটেন্যান্ট কর্নেল পাভামণি হতে পারতাম না, যেমন তুমিও হতে পারতে

না আমার কাছে সুর্মা। পারতাম কি আমরা?

না। স্বামী আর স্ত্রীর সম্পর্ক কি ওরকম হয়?

হয় না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে স্বাধিকারের রাজত্ব। পরস্পরকে নিয়ে তারা যা খুশি করতে পারে। কিন্তু যেখানে অধিকার নেই, যেখানে লোকলজ্জার ভয়, যেখানে সমাজের শাসন, মানুষের নিষিদ্ধ বিদ্যুৎ সেইখানে ওত পেতে থাকে।

আমি কেন তোমাকে কখনও ধরতে পারিনি বলো তো?

পারলে কী করতে?

আঁচড়ে, কামড়ে, খিমচে ভীষণ কাণ্ড করতাম।

ভাল।

হাসছ? হাসো। কিন্তু তুমি তো পাভামণির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা দেখে ফেলেছিলে। পিপিং টম, কেন তাহলে ছেড়ে দিলে আমায়? কেন ক্ষমা বা উপেক্ষা করলে?

কী করলে ভাল হত তবে?

কেন আমাকে বাড়ি ফিরে চুলের মুঠি ধরে টানলে না? কেন মারলে না গালে থাপ্পড়? কেন ঘুঁষি মেরে ঠোঁট ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে দিলে না?

তা হলে কী হত সুস্মিতা?

হত, তা হলেই হত। ওভাবেই গুহামানবের মতো পুরুষ দখল নেয় তার নারীর। তার নিজস্ব নারীর।

পাগল!

শুনেছি অ্যাকশনের সময় তুমি ছিলে ভয়ঙ্কর। সাহসী, বেপরোয়া, নিষ্ঠুর, একরোখা। কেন তা হলে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লে না?

ওইভাবেই কি জয় হতে চায় নারী?

চায়। উপেক্ষা চায় না। উপেক্ষার চেয়ে আক্রমণ ভাল।

তাই?

হ্যাঁ তাই। আর সেজন্যই আমার মনে হয়, তুমি কখনও একটু ভালবাসোনি আমাকে।

আর তুমি?

তোমার ভিতরে দুজন পুরুষ ছিল। একজন শান্ত,

উত্তেজনাহীন, নিরীহ এবং গৃহস্থ। অন্যজন যেত যুদ্ধ করতে, যেত অ্যাকশনে, বিপজ্জনক সব এনকাউন্টারে। আমি যোদ্ধা লোকটার জন্য দুশ্চিন্তা করতাম, তার জন্য ভয় হত, তার জন্য অপেক্ষা করতাম। কিন্তু সে কখনও ফিরে আসত না আমার কাছে। ফিরে আসত শান্ত, নিরীহ, গৃহস্থ মানুষটি। আই নেভার মেট দি সোলজার।

বটু মাথা নেড়ে বলে, ঠিক কথা। ঠিক কথা সুস্মিতা।

তোমার ভিতরে আমি কখনও তোমাকে খুঁজেই পেলাম না। কোথায় লুকিয়ে রইলে তুমি? তুমিই তো ভালবাসতে দাওনি আমায়। ওরা পেল, আমি কেন খুঁজে পেলাম না তোমাকে?

কারা পেল?

সুর্মা পেল, অপরাজিতা পেল, আরও কারা যাদের কথা তুমি বললে না আমাকে।

ঘন ঘন মাথা নাড়ল বটু, ওরকম নয় সুস্মিতা, ঠিক ওরকম নয়। চকিতে ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়ে যে মরে যায় তার উজ্জ্বলতা বেশি। অনেকটা উল্কার মতো। স্থির যে তার উজ্জ্বলতা কোথায়? সে মিটমিট করে।

কেন তুমি এরকম? কেন তুমি দুটো মানুষ?

দি সোলজার ওয়াজ অলওয়েজ আন্ডার কম্যান্ড। দি ম্যান ওয়াজ নট।

একথাটার মানে কী?

বটু মাথা নেড়ে বলল, জানি না। এক একটা কথা হঠাৎ অমনি বেরিয়ে যায়।

তবে কি তুমি বুড়ো হচ্ছ?

জীবনপ্রবাহ যদি কালসিন্ধু পানে ধায়, সুস্মিতা, ফিরাব কেমনে?

তাড়াতাড়ি বুড়ো হও। খুব তাড়াতাড়ি।

কেন সুস্মিতা?

তুমি বুড়ো না হলে আমার শান্তি নেই। ও কেন তোমাকে বলল, এইখানেই থেমে থাকুন! কেন বলল, আর বুড়ো হবেন না কিন্তু?

অপরাজিতা আর তুমি তো এক নও।

সত্যি করে বলো তুমি কি ওকে ভালবাসছ?

বটু মাথা নেড়ে বলল, বলতে পারি না।

তার মানে বাসছ। ওই ধুমসী তোমার মাথাটা খেল কী করে? কী দেখলে তুমি ওর মধ্যে? এত অল্প সময়ে? তবু ভাল পুরী যেতে রাজি হওনি! ও তোমাকে চিবিয়ে খেত তা হলে।

বয়স বসে নেই সুস্মিতা। এখন কি আর—

এই তো নষ্ট হওয়ার বয়স। ওরও, তোমারও।

বলছ?

বলছি। ও যদি আর বেশি এগোয় তা হলে বরং আমার সেলাইয়ের কৌটো থেকে ক্যাপসুলটা বের করে খেয়ে নিয়ো।

কোন ক্যাপসুল?

কেন, সেই যে গুণ্ডামি করে কালীবাবুর কাছ থেকে সায়ানাইড ক্যাপসুল চুরি করলে? সব জানি।

হ্যাঁ। খুব আকর্ষণীয় জিনিস।

খেয়ো।

তুমি কি জানো সুস্মিতা, সায়ানাইড ক্যাপসুল যদি খোলাবাজারে ছাড়া যায় তা হলে তা ভায়াগ্রার চেয়েও অনেক বেশি বিকিয়ে যাবে?

মরণ! জানি না আবার! শেষ অসুখটার সময় আমারও তো কতবার মনে হয়েছে ওরকম কিছু গিলে মরে যাই। কত লোকের কত কষ্ট, কতজন মুখিয়ে আছে মরার জন্য।

ভয়ও পায়।

আস্তে আস্তে মরতে ভয় পায়। চটজলদি মরতে নয়।

জানি। খুব জানি।

বেশ লোক তুমি। দিব্যি একটা সায়ানাইড ক্যাপসুল জোগাড় করে বসে আছ। স্বার্থপর কোথাকার, কালীবাবুর আর বোধহয় মরাই হবে না।

মরেই আছে।

শেষ কথাটা শুনতে পেল শিমুল বসু।

নমস্কার কর্নেল সাহেব। মরার কথা কী বলছিলেন?

বটু হাসল, গীতার কথা।

গীতা?

হ্যাঁ। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, নিমিত্ত মাত্র হও সব্যসাচী, ওরা মরেই আছে।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি বটে। গীতা টীতায় বেশ ভাল ভাল কথা আছে। আচ্ছা এই যে এতকাল ধরে সব ভাল ভাল কথা বলা হল এগুলো গেল কোথায় মশাই? সবই কি ভস্মে ঘি ঢালা নয়?

তাই হবে বোধহয়। ডেল কার্নেগি পড়ে উপকার হচ্ছে?

দূর মশাই, ও সবও তো ভাল ভাল কথা। কথা দিয়ে কী হয়? আসল হল অ্যাকশন।

ছয়

বাসুদেব মিদ্দার থেমে গিয়েছিল। ফটকটা আর ডিঙোয়নি। হয়তো কলের দরজা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। হয়তো মাটির তলার বিদেশে নিজেকে বেমানান দেখে গুটিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পলকহীন শীতল খুনীর চোখে স্থির চেয়ে ছিল পিঙ্কির দিকে।

কী চায় লোকটা? কী চায়? আমাকে খুন করবে? কিন্তু কেন? আমি ওর কী করেছি?

এই প্রশ্নটাই সে সাজুকে করল রাত্রিবেলা, লোকটা কী চায় বলো তো!

সাজু সামান্য চিন্তিত হয়ে বলল, ক্রিমিন্যালদের সাইকোলজি খানিকটা ডিরেঞ্জড। সবসময়ে লজিক্যাল কাজ করে না। এনিওয়ে কয়েকদিন পুলিশ এসকর্ট নাও। আর নীচেও কয়েকদিন পুলিশ পোস্টিং করে দিচ্ছি।

তীব্র স্বরে পিঙ্কি বলল, না, কক্ষনও না।

অবাক সাজু বলল, কেন?

আমি পুলিশ নিয়ে ঘুরব, তুমি কী পেয়েছ আমাকে? আমার বন্ধুরা কী বলবে?

দোষের কী আছে? নিরাপত্তার জন্য—

থামো। আমি তোমার বউ বলে না হয় পুলিশের অ্যাডভান্টেজ আছে, কিন্তু যদি তা না হতাম তা হলে কী হত?

তা হলে বাসুদেব মিদ্দারের সঙ্গে তোমার দেখাই হত না।

বাসুদেব মিদ্দার না হলেও বিপদ আপদ অন্য দিক থেকেও আসে। আমি কিছুতেই পুলিশের এসকর্ট নেবো না। আর বাড়িতেও পুলিশ পোস্টিং করতে হবে না।

কিন্তু তুমি যে ভয় পাচ্ছ!

তুমি লোকটাকে অ্যারেস্ট করছ না কেন?

পেলে করব। যতদূর মনে হচ্ছে লোকটা এখন গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। তোমাকে ও কী বলতে এসেছিল?

সেই এক কথা। ও গাঁয়ে ফিরতে পারছে না। ওকে কারা যেন খুন করতে চায়। ওর ধারণা তুমি ওর গাঁয়ে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সাজু হাসছিল।

হাসছ কেন?

ব্যাপারটা হাস্যকর বলেই, যে-লোকটার নিজেরই সিকিউরিটি দরকার, তার জন্যই আবার তোমারও সিকিউরিটির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

ভ্রূ কুঁচকে পিঙ্কি বলল, হেসো না। আমার রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে।

শোনো পিঙ্কি, তোমাকে তো পুলিশ নিয়ে সারাক্ষণ ঘুরতে হবে না। সাদা পোশাকের পুলিশ তোমাকে পাতালরেল অবধি পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাঃ, লোকটা যদি কলেজের গেটে গিয়ে উদয় হয়? কিংবা যদি হেলথ ক্লাবে যায়?

বি লজিক্যাল। বাসুদেব মিদ্দার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার একটা এঁদো গাঁয়ের মানুষ। সে তোমাকে ভাল করে চেনেইনা। তুমি কোন কলেজে পড় বা কোন জিমন্যাসিয়ামে যাও তা তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সে তোমাকে বড়জোর বাড়ি থেকে ফলো করবে। সেই সময়ে তাকে ধরতে সুবিধে। প্রথমে ইভ টিজিং-এর চার্জে। তারপর অন্যান্য চার্জ।

পিঙ্কি অবাক হয়ে বলে, ইভ টিজিং?

হ্যাঁ, প্রথমে তাই।

হোয়াট এ জোক। কিন্তু প্লিজ, সাদা পোশাক বা ইউনিফর্মড কোনও পুলিশ এসকর্ট আমার দরকার নেই। খবর্দার, তুমি ওসব করবে না।

তা হলে?

তা হলে আবার কী! আই হ্যাভ টু টেক দি রিস্ক।

সাজু একটু ভাবল। তারপর বলল, লোকটা হয়তো তোমার ক্ষতি করতে চাইছে না। হয়তো একটা পারসোন্যাল অ্যাপিল করতে চাইছে, যাতে তুমি আমাকে বলে কয়ে ওর গাঁয়ে পাঠাও।

আমি ওকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলাম, মনে রেখো, ও হয়তো প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

এনিওয়ে, ক্রিমিন্যালদের সাইকোলজি একটু অন্যরকম। আর একটা ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?

কী ব্যবস্থা?

পুলিশের বদলে যদি কর্নেল বটকৃষ্ণ রায় তোমাকে এসকর্ট করেন?

একটা হার্টবিট মিস করল ফের। একটা শ্বাস কেটে গেল। একটু সাদা মুখে পিঙ্কি বলল, হোয়াই হিম? বাসুদেব মিদ্দারের মতো ক্রিমিন্যালের সঙ্গে—

কর্নেল রায় ইজ এ টাফ ম্যান। ভেরি ভেরি টাফ।

না। নাটক করার দরকার নেই। কলকাতা শহরে একটা ইয়ং মেয়ে এসকর্ট নিয়ে ঘুরছে এটা মোটেই সম্মানের নয়।

দেন লেট আস কাম টু এ প্যাক্ট।

হোয়াট প্যাক্ট?

আমি না হয় একটু দেরি করে বেরোব, তুমি যদি একটু আরলি বেরোও তা হলে তোমাকে আমিই পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।

তুমি!

হ্যাঁ আমি।

পিঙ্কি তার স্বামীর দিকে একটু চিন্তিত চোখে চেয়ে রইল। গ্যাস লিকের সময় এই লোকটাই এক পায়ে মোজা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

মাথা নেড়ে পিঙ্কি বলল, না থাক। তোমাকে দেরি করতে হবে না।

আরও একটা উপায় আছে।

কী?

কয়েকদিন বাপের বাড়ি থেকে ক্লাস করো। ততদিনে লোকটা অ্যারেস্ট হয়ে যাবে।

প্রস্তাবটা খারাপ নয়। কিন্তু পিঙ্কির মনটা এ প্রস্তাবে নেচে উঠল না। বাপের বাড়িতে রাবণের গুষ্টি। হাঁফ ছাড়ার জায়গা নেই। আর দিনরাত চেঁচামেচি, কথাবার্তায় মাথা ধরে যায়। দক্ষিণ কলকাতার এই নির্জনতায় এবং ফ্ল্যাটের প্রশস্ততায় সে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি গিয়ে প্রিয়জনদের দেখে আসতে ভালবাসে। থাকতে ইচ্ছে করে না।

বাপের বাড়ি! বলে পিঙ্কি একটু ভাবল।

আই শ্যাল মিস ইউ। কিন্তু এ ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না।

ভেবে দেখি। বাচ্চুর চিকেন পক্স হয়েছে শুনেছি। গেলে যদি আমারও ইনফেকশন হয় সেইটেই ভাবছি।

ও বাবা, তা হলে দরকার নেই। চিকেন পক্স ভীষণ কন্টেজিয়াস।

সুতরাং ব্যাপারটা একটা তিন রাস্তার মোড়ে থেমে রইল।

পিঙ্কি বলল, কাল তো রবিবার। ভাববার জন্য একদিন সময় পাওয়া যাবে।

আপনিই টমেটো মাসি! ইস, আপনি কী সুন্দর দেখতে!

তাকে জড়িয়ে ধরে অপরাজিতা বলল, তুমিও ভীষণ অ্যাট্রাকটিভ। আর টমেটো মোটেই আমার নাম নয়। তুমি কী করে জানলে নামটা?

সেদিন ফোনে কথা হচ্ছিল শুনছিলাম।

ওঃ, দুষ্টু মেয়ে। ফর্সা অপরাজিতা হঠাৎ লাল হল।

এক গাদা বিদেশি উপহারে পিঙ্কিকে ঢেকে দিল অপরাজিতা। শাড়ি, কসমেটিক্স, সাবান, পারফিউম, একটা হাতঘড়ি অবধি।

পিঙ্কি বিহ্বল হয়ে বলল, এত কেন?

ও সব তোমাকে হিসেব করতে হবে না। কর্নেল রায় কোথায়?

উনি তো এ সময়ে থাকেন না। ইভনিং ওয়াক-এ যান।

জানি। অনেক রাতে ফেরেন বোধহয়?

হ্যাঁ।

অপরাজিতাকে দেখে মুগ্ধ হল পিঙ্কি। চেয়ে থাকার মতো চেহারা। এখনও এই বয়সেও ঝলমল করছে। কিন্তু মৃতা বান্ধবীর পরিবারের সঙ্গে কেন এই ঘনিষ্ঠতা! কেন এত উপহার এবং রেস্তোরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া? সাজুও রাজি হওয়ার আগে একটু কিন্তু-কিন্তু করেছিল, ওঁদের তো প্রায় চিনিই না। এতক্ষণ সময় কাটাব কী করে?

কিন্তু সৌজন্য বলেও একটা ব্যাপার আছে। আছে মৃতা মায়ের সম্মান।

মরূদ্যান আর অপরাজিতা তাদের গাড়িতে করে যে ঘ্যাম রেস্তোরাঁয় তাদের নিয়ে গেল সেখানে ঢোকার কথা ভাবতেই পারে না পিঙ্কি আর সাজু। ঠাঁটবাটের জায়গা। আগে থেকে বুক করা প্রাইভেট টেবিলে তারা বসল। পিঙ্কি আর অপরাজিতা পাশাপাশি, ওপাশে সাজু আর মরূদ্যান।

সুস্মিতার কথা দিয়েই শুরু করল অপরাজিতা।

শাশুড়িকে কতদিন পেয়েছ তুমি?

বেশি দিন নয়। বিয়ের এক মাসের মধ্যেই—

ভাল করে পরিচয়ই হল না, না?

না।

খুব যন্ত্রণা পেয়েছিল?

অস্বস্তি বোধ করতেন। সেই সময়ে আমাকে কাছে থাকতে দেননি। বলেছিলেন, এ সব অসুখবিসুখ দেখলে— তুমি কচি মেয়ে, তোমার মন খারাপ হবে। ক'টা দিন বাপের বাড়ি গিয়ে থাকো।

ভয় পায়নি, না?

না। কান্নাকাটিও করেননি কখনও।

আমার বাবা, মরার কথা ভাবলেই ভয় করে। মন খারাপ

হয়ে যায়। সুস্মিতা এত সাহস কোথা থেকে পেল? অবশ্য—

কী অবশ্য?

কর্নেল রায়ের মতো লোক পাশে ছিল বলেই বোধহয় অত সাহস!

কথাটার মানে বুঝতেই পারল না পিঙ্কি। তবু চুপ করে রইল।

অপরাজিতা বলল, তোমরা ড্রিংক করতে পারো, লজ্জা পেয়ো না। সাজু, সংকোচ কোরো না বাবা। আমি সম্পর্কে মাসি হলেও আধুনিক মাসি। স্বচ্ছন্দে ড্রিংক করতে পারো।

সুতরাং ড্রিংক এল। পিঙ্কির সামনেও ওয়াইনের গ্লাস রেখে গেল বেয়ারা।

আমি তো খাই না।

না খেলে পড়ে থাক।

দাম নেবে না?

নেবে, তাতে কী? আজ হিসেব কোরো না তো পিঙ্কি। কী খাবে বলো। ওঃ, তুমি তো হেলথ ফুড খাবে, না?

খাওয়ার কথা থেকে কথা ধীরে ধীরে বিচরণ করছিল বিলেতে, এ দেশে, নানা স্মৃতিচারণে। তারপর একসময়ে চলে এল কর্নেল বটকৃষ্ণ রায়। আর অপরাজিতার ফর্সা মুখে টমেটোর রক্তিমাভা সঞ্চার করে দিচ্ছিল খানিকটা লজ্জা, খানিকটা ভারমুখ।

হোয়াট এ ম্যান। হোয়াট এ ম্যান!

পিঙ্কি দেখল, মহিলার চোখ মদির হয়ে গেল, স্বপ্নাতুরতায় কোমল হয়ে গেল মুখশ্রী। এক গভীর সম্মোহনে ডুবে যেতে যেতে অপরাজিতা বলছিল, আমি এরকম পুরুষ আর দেখিনি, জানো! সুস্মিতা কিন্তু কখনও ওর বরের কথা তেমন কিছু লিখত না। কেন লিখত না কে জানে। হয়তো ভয় পেত কেড়ে নেব বুঝি। বারো বছর আগে যখন প্রথম দেখলাম ওকে, সুস্মিতাকে কী বলেছিলাম জানো! বলেছিলাম, সর্বনাশী! এ কাকে বিয়ে করেছিস! জ্বলে পুড়ে মরবি যে!

পিঙ্কির বুঝতে আর লহমাও লাগল না, ভদ্রমহিলা—এই

সো কলড অপরাজিতা মাসি—অসহায়ভাবে কর্নেল বটকৃষ্ণ রায়ের প্রেমে পড়ে গেছেন। বার্ধক্যের কাছঘেঁষা মধ্যবয়সের এই প্রেম মজারই ব্যাপার। কিন্তু পিঙ্কি একটুও মজা পেল না। তার বুক হঠাৎ জ্বালা করছিল। ভদ্রমহিলাকে সে ঘেন্না করতে শুরু করল। সুস্বাদু খাবার মুখে ঠেকল বিস্বাদ। সে ওয়াইনের গ্লাসটা তুলে ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল।

তারপর কী যে অসহ্য কাটল সন্ধেটা তা পিঙ্কি বলতে পারবে না। অসহ্য! অসহ্য। তার বারবার উঠে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল।

রাত্রিবেলা বিছানায় তাকে একটু চুমু খেয়ে সাজু বলল, সামথিং রং?

হোয়াটস রং?

তোমার মুড অফ কেন?

আমার ভাল লাগছে না।

এসো।

না।

আর জোর করল না সাজু। পেটে মদ ছিল। সে ঘুমোলো। ঘুম এল না পিঙ্কির। জ্বালাধরা চোখে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল সে।

অনেকক্ষণ বাদে তন্দ্রা এল হঠাৎ এক অসতর্কতায়। আর তখনই এক অন্ধকার বিশাল পুরুষের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল সে।

কে তুমি?

একবার জিজ্ঞেস করল পিঙ্কি। তারপর মনে হল, কী হবে জেনে? কী হবে অন্ধকারকে পরিচয়ে টেনে এনে?

নিস্তব্ধ সকালে টেলিফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল পিঙ্কির।

ধরম ফোনটা ধরল। একটু পরে দরজায় টোকা দিয়ে বলল, সাহেব, আপনার ফোন।

সাজু একটা বিরক্তির শব্দ করে উঠল। তারপর গিয়ে ফোন ধরল।

হেল্লো।

.....

হোয়াট!

.....

মাই গড! তারপর?

.....

ও কে...ও কে।

পিঙ্কি উঠল।

কী হয়েছে?

সাজুর মুখে দুশ্চিন্তা। মুখটা বিকৃত করে বলল, দ্যাট বাস্টার্ড বাসুদেব।

পিঙ্কির বুকটা ধক করে ওঠে।

কী করেছে লোকটা?

আর বোলো না। একটু আগে নাকি বিবেকানন্দ পার্ক থেকে লোকটাকে পিক আপ করার চেষ্টা করেছিল পুলিশ। দু-জনকে স্ট্যাব করে পালিয়েছে।

ভয়ে পিঙ্কি এতটুকু হয়ে গেল।

তুমি ক্যালকাটা পুলিশকে অ্যালার্ট করেছিলে?

সাজু সামান্য অস্বস্তির সঙ্গে বলল, হ্যাঁ। লোকটা এখানে ঘোরাফেরা করছে, এটা তো ভাল ব্যাপার নয়।

পিঙ্কি চুপ করে রইল। পার্কে কী করছিল লোকটা? কার জন্য অপেক্ষা করছিল?

তা কে জানে!

এখন কী হবে?

সাজু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কী আর হবে। পুলিশের কাজ পুলিশ করবে।

যাদের স্ট্যাব করেছে তারা কি মারা গেছে?

না। সুপারফিশিয়াল ইনজুরি।

আমার ভয় করছে।

ভয়ের কী আছে! ও তো আর সুপারম্যান নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে।

ওকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছিল কেন? ইভ টিজিং-এর জন্য নয় তো?

সাজু ফের অস্বস্তি বোধ করল। বলল, কোনও স্পেসিফিক চার্জ নেই। সন্দেহজনক আচরণের জন্য।

ও।

অ্যারেস্ট তো তুমিই করতে বলেছিলে পিঙ্কি।

পিঙ্কি মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। আমিই বলেছিলাম তো। কিন্তু অ্যারেস্ট তো করতে পারল না পুলিশ। এখন তো লোকটা আরও খেপে যাবে।

আমি বেরোচ্ছি। চারদিকে সার্চ করা হচ্ছে। যাবে কোথায়?

পিঙ্কি একটা বদ্ধ শ্বাস ছাড়ল। বলল, কী যে হবে।

ভয় পেয়ো না। নীচে পুলিশ পোস্টিং করে দিচ্ছি।

সেটা খারাপ দেখাবে। লোকে অবাক হবে, জানতে চাইবে কী হয়েছে।

উর্দি পরা পুলিশ নয়, প্লেন ড্রেস।

পিঙ্কি শুকনো মুখে বলল, শোনো, একটা কথা বলি।

কী?

লোকটাকে আমি কেন ভয় পাচ্ছি জানো?

কেন?

সেদিন যখন তুমি ওকে বের করে দিলে সেদিন কিন্তু তোমাকে ও একটুও ভয় পাচ্ছিল না। কেমন ঠাণ্ডা খুনির চোখে তোমার দিকে চেয়ে ছিল।

সাজু বিরক্ত হয়ে বলল, এ সব মশা মাছিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময় আমার নেই।

লোকটা খুব ডেসপারেট।

সেটা জানি। কিন্তু ভেবো না, আর ঘণ্টা দু তিনের মধ্যেই ওকে পুলিশ তুলে নেবে।

পিঙ্কির তবু দুশ্চিন্তা গেল না। সে বুঝতে পারছে না বাসুদেব এখন কী চায়।

সাজু স্নান করে বেরিয়ে এসে বলল, বাবা কোথায় বলো তো!

উনি কি এ সময়ে বাড়িতে থাকেন? জগিং করতে গেছেন।

বাবাকে একটু অ্যালার্ট করা দরকার। আর শোনো, নীচের

ড্রয়ারের লকটা খুলে আমার রিভলভারটা বের করে দাও।

রিভলভার কেন? মারবে নাকি?

আরে না। টু বি অন দি সেফ সাইড। ভয় দেখাতেও কাজে লাগে।

আবার ফোন এল। সাজুই ধরল।

হেল্লো।

.....

পোস্টিং হয়েছে! দ্যাটস গুড।

.....

হ্যাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরোচ্ছি। ও কে।

সাজু যখন ডিম রুটি নিয়ে টেবিলে বসেছে সেই সময়ে কর্নেল বটকৃষ্ণ রায় ফিরল। হলঘরে ঢুকে ছেলের দিকে চেয়ে বলল, নীচে পুলিশের জিপ আর প্লেন ড্রেস পুলিশ কেন রে? কী হয়েছে?

সাজু মুখ তুলে বাবার দিকে চেয়ে বলল, একটা বাজে লোক কিছু ঝামেলা পাকাচ্ছে।

একটা লোক!

হ্যাঁ বাবা। তুমিও একটু অ্যালার্ট থেকো।

বটু ছেলের উল্টো দিকের চেয়ারে বসে বলল, সেদিন বউমা যাকে দেখে রেগে গিয়েছিল সে-ই নাকি?

হ্যাঁ। বাসুদেব মিদ্দার। ক্রিমিন্যাল টাইপের লোক।

বটু একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, ব্যাপারটা কী একটু খুলে বল। কী করেছে লোকটি? কী চাইছে?

সাজু বলল, গ্রাম থেকে পার্টির তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গাঁয়ে পলিটিক্স করত, চুরি-ডাকাতি খুন সবই করত। পার্টির ফ্যাকসানের সঙ্গে গণ্ডগোলে ওর ছোট ছেলে খুন হয়। তারপর...

পাথরের মূর্তির মতো বসে বটু সব শুনে গেল। তারপর বলল, ও। তার জন্যই পুলিশ পোস্টিং?

হ্যাঁ বাবা। পিঙ্কি তবু একটু টেনশনে আছে।

হুঁ।

তুমি একটু অ্যালার্ট থাকলে ভাল হয়।

খাপ আর বেল্ট সমেত রিভলভারটা এনে পিঙ্কি হলঘরের ক্যাবিনেটের ওপর রেখে বলল, এই যে তোমার জিনিস।

বটু একবার রিভলভারটার দিকে চেয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

লোকটাকে অ্যারেস্ট করতে চাস?

হ্যাঁ।

নীচে অত অ্যাক্টিভিটি দেখলে লোকটা তো ধারেকাছেও আসবে না।

আমরা তো চাইছি লোকটা ধারে কাছে না আসুক।

তা হলে ট্র্যাপ করবি কী ভাবে?

কী করতে বলছ তুমি?

পুলিশ পোস্ট তুলে নে।

তুলে নেব?

হ্যাঁ, লেট হিম কাম।

সাজু বিস্ময়ে বাবার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, হি ইজ নাউ এ ডেনজারাস ম্যান। আজ সকালে দুজন পুলিশকে স্ট্যাব করেছে।

তাতে কী হল? পুলিশ তুলে নে।

সেটা রিস্ক হবে না?

কীসের রিস্ক? লোক তো একটা।

বাট হি ইজ এ ক্রিমিন্যাল।

ছেলের দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বটু বলল, অ্যান্ড হু ইজ নট?

ক্যাবিনেটে ভর দিয়ে পিঙ্কি দৃশ্যটা দেখছিল। একদিকে তার আই পি এস স্বামী, অন্য দিকে তার ঘরবাসী নিষ্কর্মা শ্বশুর। কার হাতে কর্তৃত্ব? কে এই পরিস্থিতি নিয়ন্তা? কার ব্যক্তিত্ব ও আদেশ বহাল থাকবে? ছোট্ট একটা নাটক।

কর্নেল বটকৃষ্ণ রায়ের দিকে চেয়ে সাজু বলল, উইল দ্যাট বি এ গুড ডিসিশন?

লোকটা তাড়া খেয়ে বেড়াচ্ছে। লোকটা শোকাতপা। লোকটা নিরাশ্রয়। সে তোর কাছে শেলটার চাইছে। তাই তো?

দ্বিধার সঙ্গে সাজু বলল, হ্যাঁ, সেটাও ঠিক কথা। বাড়িতে

এসে বারবার বিরক্ত করছিল বলে ওকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তারপর ও পিঙ্কিকে ফলো করতে শুরু করে।

তোমাদের সরকারি দফতরে ওদের কেউ ঢুকতে দেয় না বলেই হয়তো বাড়িতে এসেছিল।

কিন্তু বাবা, লোকটার বোধহয় এখন মাথার ঠিক নেই।

বটকৃষ্ণ রায়ের গলায় একটি কঠিন মিলিটারি স্বর একটি মাত্র আদেশ উচ্চারণ করল, পুলিশ উইথড্র করে নে।

আদেশের সামনে মাথা নোয়াল সাজু। ঠিক আছে, নিচ্ছি। আর উই টেকিং দি চার্জ অফ দি সিচুয়েশন?

হ্যাঁ।

সাজুর মুখে একটা ভরাট নিশ্চিন্তের ভাব দেখতে পেল পিঙ্কি। গুহামানবের মতো উঠে দাঁড়াল বটু। ধীর পদক্ষেপে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। পিঙ্কি দাঁতে দাঁত পিষে বিড় বিড় করে বলল, আই হেট ইউ! আই হেট ইউ!

শেষ অবধি রিভলভারটা নিল না সাজু। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পিঙ্কি দেখল, সাজু আর পুলিশের দলবল জিপে উঠে চলে গেল।

বটু খেতে বসেছে। পিঙ্কি হলঘরে এসে ক্যাবিনেটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

বটু তার দিকে না তাকিয়েই বলল, তুমি কখন বেরোবে?

বারোটায়।

বটু কব্জির ঘড়িটা একবার দেখে নিল। এখন আটটা বেজে পনেরো। কিছু বলল না আর। পিঙ্কি সম্মোহিতের মতো চেয়ে ছিল। সে দেখছিল, একজন আদিম মানুষ পাথরের ওপর বসে তার সদ্য শিকার করা জানোয়ারের কাঁচা মাংস খাচ্ছে। চকিতে চেয়ে দেখে নিচ্ছে চারধারে, কোনও আকস্মিক বিপদ এসে হাজির হল কি না। তাকে জীবন আর মৃত্যুর সীমানা ধরে বেঁচে থাকতে হয়। সেই লোকটার বিনাশ হল না কখনও। যুগ যুগ পার হয়ে গেল, কত উত্থান পতন, মানুষ কতবার পোশাক পাল্টাল, তবু সেই সনাতন গুহামানব এখনও পৃথিবীর জাঙ্গাল ভেঙে চলছে তো চলছেই। দৃকপাত নেই তার কোনও দিকে।

বটু ধরমকে ডেকে বলল, নীচে গিয়ে দারোয়ানদের বলে এসো, কাউকে যেন না আটকায়। কেউ ওপরে আসতে চাইলে যেন আসতে দেয়।

পিঙ্কি শিউরে উঠল। মাঝে মাঝে মিস হচ্ছে হার্টবিট। মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে শ্বাস। হাঁফ ধরা লাগছে।

পিঙ্কি নিজের ঘরে এসে ব্যায়ামের পোশাক পড়ল। তারপর ডুবে গেল শরীরকে ক্লান্ত—আরও ক্লান্ত করে দিতে।

ঠিক এগারোটায় ডোরবেল বাজল। পিঙ্কি সবে স্নান করে বেরিয়েছে। মনে দুশ্চিন্তা, ভয়। ডোরবেলের শব্দে বুকটা ধক করে উঠল। একটু শক্ত হয়ে থেকে সে ফের সহজ হল। দরজা খুলে সে হলঘরে বেরিয়ে এল।

কর্নেল বটকৃষ্ণ রায় গিয়ে দরজাটা খুলে দাঁড়াল। যেন এক পাহাড়।

পিঙ্কি লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল। শর্ট হাইট, মাসকুলার। সেই শীতল খুনির অপলক চোখ। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও মুখে হাতচাপা দিল সে।

লোকটা বটকৃষ্ণ রায়ের চোখে তিন থেকে চার সেকেন্ডের বেশি চোখ রাখতে পারল না। ধীরে ধীরে মাথা নুয়ে গেল বুকের কাছে। তারপর হঠাৎ লোকটা স্তূপাকার হয়ে ভেঙে পড়ল বটকৃষ্ণ রায়ের পায়ের ওপর, বাবু আমাকে বাঁচান।

বটু ধীর গলায় বলল, ওঠো। ভিতরে এসো।

লোকটা মুখ তুলে হাঁ করে বটুর মুখে দিকে চেয়ে বলল, ভেতরে আসব বাবু? আমি!

হ্যাঁ।

পিঙ্কির হাত থর থর করে কাঁপছে। কী করছে তার কাণ্ডজ্ঞানহীন শ্বশুর? কী করছে এটা?

লোকটা বটুর পিছু পিছু এল। ভয়ে, সংকোচে বিহ্বল, বিভ্রান্ত। এ যেন সেই বাসুদেব মিদ্দার নয়। অন্য লোক।

চেয়ার দেখিয়ে বটু তাকে বলল, বোসো।

লোকটা সেই অলঙ্ঘ্য আদেশ অমান্য করতে পারল না। বসল। একটু হাঁফাচ্ছে। চোখে জল। ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল,

জানের জন্য পার্টি করতে হয় বাবু, এমনি এমনি করি না। আমার ছেলেটাকে বুচুবাবু খুন করাল। আমাদেরও খুঁজছে ওর লোক...

বটু ফোনটা তুলে নিল।

একবারে নয়, বেশ কয়েকবার নানা দফতর থেকে খোঁজ নিয়ে অবশেষে সাজুকে ধরতে পারল বটু।

সাজু, বাসুদেব মিদ্দার এসেছে।

সাজুর চিৎকার টেলিফোন থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়েও শুনতে পেল পিঙ্কি, হোয়াট! কোথায়....কোথায়....?

উত্তেজিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের ঘরেই বসে আছে।

বসে আছে? বসে আছে বাবা?

হ্যাঁ। ওকে অ্যারেস্ট করার দরকার নেই।

বলছ কী? হি ইজ এ ক্রিমিন্যাল!

আমি জানি।

সাজুর উত্তেজিত গলা বলল, পিঙ্কি কোথায় বাবা?

এই তো, এখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

ইজ শী সেফ?

বটু একটু থামল, হ্যাঁ। শী ইজ ভেরি মাচ সেফ।

আমাকে কী করতে বলছ তুমি?

ওকে গাঁয়ে পৌঁছে দে।

কিন্তু আজ সকালে ও দুজন পুলিশম্যানকে স্ট্যাব করেছে।

সিরিয়াস ইনজুরি কি?

না।

দেন পুট ইট আউট অফ দি রেকর্ড।

তারপর কী করব?

ওকে গাঁয়ে নিয়ে যা। নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যা।

গিয়ে?

কল এ মিটিং উইথ অ্যানাদার ক্রিমিন্যাল বুচুবাবু। গিভ হিম এ গুড থ্রেট।

তাতে হবে?

হবে। তুই নিজে গেলে হবে।

একা যাব?

না। গো উইথ ইওর ব্যাটালিয়ন।

লোকটাকে ছেড়ে দিতে বলছ বাবা! কাজটা কি ঠিক হবে?

নয় কেন? ও যেখানে থাকে সেটা ক্রিমিন্যালদের বীজতলা।

জানি।

রিহ্যাবিলিটেট হিম। ওখানেই ওদের বাঁচামরা। ওকে যেতেই হবে।

লোকটা কী করছে?

বসে আছে। ধরমকে বলছি ওকে কিছু খেতে দিতে। ততক্ষণে তুই চলে আয়।

ও কে। অ্যাজ ইউ সে।

ফোনটা রেখে বটু ফিরে দাঁড়াল বাসুদেব মিদ্দারের দিকে।

ঈশ্বরের দিকে লোকে যেমন চেয়ে থাকে তেমনি বটুর দিকে চেয়ে বাসুদেব মিদ্দার কান্নায় স্খলিত গলায় বলল, গাঁয়ে যাবো বাবু?

যাবে।

সাহেব নিজে নিয়ে যাবেন?

হ্যাঁ।

সেই কথাটাই বলতে এসে কতবার ফিরে গেছি বাবু। আমার অপরাধ নেবেন না। আপনি ভগবান।

আবার পায়ের ওপর পড়ল বাসুদেব। বটু তাকে ধরে তুলল।

যাও, হাতমুখ ধুয়ে এসো। কিছু খাও।

পিঙ্কি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভয়ঙ্কর লোকটা এখন কী করে খরগোশের মতো পোষমানা হয়ে গেল? কী করে হয়েছে এসব? এর জন্যই না রিভলভার নিয়ে বেরোতে যাচ্ছিল সাজু? হোয়াট এ জোক!

লোকটা খেল। গোগ্রাসেই খেল।

তারপর উদ্বিগ্ন মুখে সাজু এল। বাবার দিকে প্রশ্নময় চোখে চেয়ে বলল, হ্যাজ হি বিহেভড ওয়েল?

হ্যাঁ। নিয়ে যা।

সাজু বাবার দিকে চেয়ে রইল। সে জানে কর্তৃত্ব কার হাতে।

মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে। ফিরতে হয়তো একটু রাত হবে।

বাসুদেবকে নিয়ে ওরা চলে যাওয়ার পর ফ্ল্যাটটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

পলকহীন চোখে চেয়ে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়েই ছিল পিঙ্কি। বুকে ঝড়। আজ এই মধ্যাহ্নের বে-আব্রু আলোয় সে হঠাৎ ধরা পড়ল নিজের কাছে। সে পিঙ্কি তার শ্বশুর বটকৃষ্ণ রায়কে ভালবাসে। তীব্র জ্বালা, ভয়ংকর পাপবোধ। সমাজ-সংসার-সম্পর্ক সব ভেঙে পড়ছে ভিতরে ভূমিকম্পের ঘরবাড়ির মতো। এক আদিম মানবী যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে তার পুরুষের খোঁজে। আই ওয়ান্ট টু হেট ইউ, বিকজ আই লাভ ইউ।

ডাইনিং টেবিল ছেড়ে উঠে নিজের ঘরের দিকে চলে যাচ্ছিল বটু। হঠাৎ দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল পিঙ্কির দিকে। পিঙ্কি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে। পৃথিবী মুছে গেছে, স্মৃতি অবসন্ন, প্রতিরোধহীন পিঙ্কি শুধু চেয়ে আছে।

তুমি কলেজে গেলে না?

না।

কেন?

এত ঘটনা ঘটে গেল।

ও।

হার্টবিট মিস হচ্ছে। বার বার কেটে যাচ্ছে শ্বাস। পিঙ্কি আজ সকাল থেকে কিছু খায়নি। পেট জ্বালা করছে খিদেয়। বুক পুড়ে যাচ্ছে মনের দহনে।

আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

ঘরের দরজায় হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল কর্নেল বটকৃষ্ণ রায়। ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, মেদহীন, শক্তিমান পুরুষ। তীব্র এক চোখে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল পিঙ্কিকে।

বলো।

পিঙ্কি চোখ বুঁজে ফেলল। দাঁতে দাঁত চাপল। তারপর অসহায় আত্মসমর্পণের গলায় বলল, আমি আপনাকে ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি।

বটকৃষ্ণ রায় চুপ।

এই পাপ থেকে বাঁচার জন্য আমি আপনাকে ঘেন্না করতে চেয়েছি। পারিনি। কখনও পারিনি।

বটকৃষ্ণ রায়ের গম্ভীর ধীর গলা বলল, জানি।

জানেন?

জানি। তুমি কষ্ট পাচ্ছ তা-ও টের পাই।

আমি এখন কী করব?

আমি তোমার মতো সাহসী মেয়ে দেখিনি।

নির্লজ্জ?

না পিঙ্কি, তুমি নির্লজ্জ নও।

আপনি জানতেন?

হ্যাঁ। আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝতাম।

তা হলে এখন আমি কী করব?

তুমি কি জানো তুমি কত সৎ, সাহসী আর অকপট?

আমি ভাল নই।

শুধু ভালই নও, চরিত্রবতীও।

কী বলছেন?

যে এত অকপট স্বীকারোক্তি করতে পারে সে শ্রদ্ধার পাত্রী।

আপনি আমাকে ঘেন্না করছেন না তো!

না। তুমিও আমাকে আর ঘেন্না করার চেষ্টা কোরো না। যদি করো, তা হলে একদিন তোমার নিজের ওপরেই ঘেন্না আসবে। তখন বড় কষ্ট।

এখনও যে কষ্ট।

না পিঙ্কি, আঠারো বছর বয়সে এ রকম হতেই পারে। সম্পর্ক আর সমাজ মানুষ তৈরি করেছে। কিন্তু আবেগ তো তার সৃষ্টি নয়। সমাজ সংসারের আলবাঁধ ভেঙে কত আবেগ ভাসিয়ে নিয়ে যায় আমাদের।

আমি কী করব?

কিছু করবে না পিঙ্কি। শুধু অপেক্ষা করো। দেখবে আমার প্রতি তোমার ওই ভালবাসা ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে।

কীভাবে?

বুড়ো বয়সে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হয় জানো? কখনও বাবা আর মেয়ের মতো, কখনও মা আর ছেলের মতো।

আমাকে কি তার জন্য বুড়ো বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

না পিঙ্কি। তুমি মুক্ত হয়ে গেছ।

মুক্ত! কখন? কীভাবে?

যে মুহূর্তে আমার কাছে অকপটে বলে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেছে তোমার মনস্তাপ, তোমার জ্বালা, তোমার কষ্ট। একটু অপেক্ষা করো, ধৈর্য ধরো। টের পাবে।

দু চোখ দিয়ে ধারায় জল নেমে আসছে পিঙ্কির। থর থর করে কাঁপছে ঠোঁট। অসহায় শিশুর মতো লাগছে নিজেকে।

বটু মুগ্ধ চোখে এই পবিত্র দৃশ্যটা দেখছে। চোখের জলে ধুয়ে যাচ্ছে, নেমে যাচ্ছে পাপ, স্তিমিত হয়ে আসছে মনস্তাপ। একটু পরেই ওর কচি মুখে আলো ফুটে উঠবে।

বউমা।

অ্যাঁ।

কতদিন তুমি আমাকে বাবা বলে ডাকোনি।

পিঙ্কি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল, হ্যাঁ।

একবার ডাকবে?

পিঙ্কি চমকে উঠল, তারপর মাথা নাড়ল। স্খলিত কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ....হ্যাঁ বাবা।

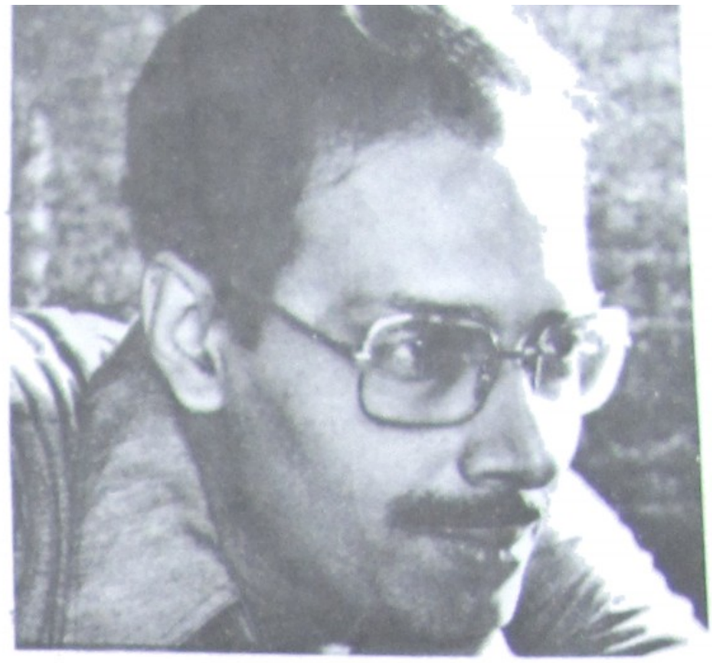

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫, ময়মনসিংহে। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন। ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ.। কলকাতার কলেজ থেকে বি. এ.। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। এখন বৃত্তি—সাংবাদিকতা। 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম গল্প—'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। এর আগে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। পরেও আরেকবার, 'দূরবীন'-এর জন্য।

'মানবজমিন' উপন্যাসে পেয়েছেন ১৯৮৯ সালের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

প্রচ্ছদ □ সুব্রত চৌধুরী